সম্পূর্ণ উপন্যাস

মুদ্রা রহস্য

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল ঝিনুক।

"তুমি, মানে আপনিই তো আঁখি সেন, তাই না? কিন্তু মিঃ বাগচী কোথায়?"

ভদ্রলোক তাকে চিনে ফেললেন, অথচ হাতচারেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দীপকাকুকে চিনতে পারলেন না! আঙুল তুলে দীপকাকুকে দেখিয়ে দেয় ঝিনুক। বছর তিরিশেকের প্রায় ছ'ফুটের উপর লম্বা লোকটি এগিয়ে যান নির্দেশ অনুযায়ী।

bojerpathshala.blogspot.com

ঝিনুক আর দীপকাকু এখন দাঁতন স্টেশনের বাইরের চত্বরে। কাঁধে রুকস্যাক নিয়ে ঝিনুক, দীপকাকুর ব্যাগটা ওঁর পায়ের সামনে। বিশাল ভারী। ল্যাপটপসহ গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় জিনিস আছে ওই ব্যাগের ভিতরে। ভোরবেলা হাওড়া থেকে বৌলি এক্সপ্রেস ধরে এখানে এসে পৌঁছেছে ঝিনুকরা। মোটামুটি আড়াই ঘণ্টার জার্নি। তদন্তের ডাক পেয়ে এসেছেন দীপকাকু। ভাগ্যবশত এই কেসে ঝিনুক তাঁর সহকারী। অন্য বহু তদন্তেই ঝিনুককে সঙ্গে নেন না। সেই সব ইনভেস্টিগেশন নাকি ঝিনুকের বয়সের পক্ষে মানানসই নয়। এই কেসে দাঁতন স্টেশন থেকে ক্লায়েন্টের পাঠানো লোক ঝিনুকদের নিতে আসবে, এমনটাই কথা হয়ে আছে। নিশ্চয়ই সেই লোকই ঝিনুক হয়ে কিছুক্ষণ হল দীপকাকুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দীপকাকু এমনিতে অ্যাভারেজ হাইট, লম্বা লোকটির জন্য একটু বেশিই শর্ট লাগছে। কিন্তু কথা হচ্ছে মানুষটি ঝিনুককে চিনলেন কীভাবে? তাও আবার ভাল নামে চেনেন। ডাকনামটাও জানেন কি?

দীপকাকুর সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষ হল লোকটির। হাতের ইশারায় ঝিনুককে ডেকে নিয়ে দীপকাকু লাগেজ তুলে ভদ্রলোকের সঙ্গে পা বাড়ালেন।

ঝিনুকরা এখন ডাক্তারি লোগো লাগানো নতুন মডেলের ফোর হুইলারে। দীপকাকুর এই ক্লায়েন্ট একজন ডাক্তার। নাম সুশোভন বসু। ঝিনুকরা তাঁর বাড়িতে চলেছে। যিনি স্টেশনে নিতে

boierpathshala.blogspot.com

এসেছিলেন, ডাক্তারবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট, অর্থাৎ কিনা কম্পাউন্ডার। তিনিই গাড়িটা চালাচ্ছেন। ঝিনুক-দীপকাকু পিছনের সিটে। কম্পাউন্ডার ভদ্রলোকের নাম শ্যামল বারিক। দীপকাকু গাড়িতে ওঠার আগে ঝিনুকের সঙ্গে আলাপ করালেন। স্টেশন চত্বর পেরিয়ে গাড়ি পাকা রাস্তায় আসতেই প্রকৃতি বিস্তার লাভ করল, দু'ধারে বড়-বড় গাছ, চাষের জমি, কখনও বা ফাঁকা মাঠ। গাড়ির বাইরে হেমন্তের নরম রোদ, জানলা দিয়ে আসা হাওয়ার ঝাপটে শীতের আগমনবার্তা। ঝিনুকের মনেই হচ্ছে না তদন্তের কারণে এসেছে এখানে। পুরোপুরি বেড়াতে আসার অনুভূতি হচ্ছে।

গত রবিবার দীপকাকু বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে এসে ঝিনুককে বললেন, "পরশু মোগলমারি যাচ্ছি। একটা ইনভেস্টিগেশনের অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি। যাবে নাকি? কলেজে এখন চাপ কেমন?"

"একদম চাপ নেই। সবে এগজাম শেষ হল। অবশ্যই যাব," বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু জানতে চাইলেন, "মোগলমারি নামটা শুনেছ আগে?"

একটু যেন চেনা-চেনা ঠেকছিল ঝিনুকের। বলেছিল, "মনে হচ্ছে কোথাও পড়েছি নামটা।"

"খবরের কাগজে। টিভিতেও এক-দু'বার দেখিয়েছে। জায়গাটা পশ্চিম মেদিনীপুরে। ওখানে মাটির তলায় একটা বৌদ্ধ মহাবিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দফায়-দফায় খননকার্য চলছে," বলেছিলেন দীপকাকু।

বাবা দাবার বোর্ড সাজানো শেষ করে বললেন, "এখন মনে পড়ল মোগলমারির খবরটা দেখেছি কাগজে। তা তোমার তদন্তটা কি ওই বৌদ্ধবিহার নিয়ে?"

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "মনে হয় না। ক্লায়েন্ট ডাঃ সুশোভন বসু ফোনে যা বললেন, ওঁর বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছে, কিছু রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে। সে ব্যাপারে আমাকে দিয়ে তদন্ত করাতে চান।"

দাবার প্রথম দান চেলে বাবা বলেছিলেন, "তুমি তো রীতিমতো ফোমস হয়ে গিয়েছ হে! কত দূর-দূর থেকে ইনভেস্টিগেশনের ডাক আসছে। বয়স এখনও চল্লিশ পেরয়নি, এর মধ্যেই এত নাম!"

"তা একটু হয়েছে বই কী। আজকাল আর ক্লায়েন্টসের জিজ্ঞেস করি না, 'আমার রেফারেন্স কার থেকে পেলেন?' " বাবার লেগ পুলিটা দিব্যি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন দীপকাকু। ঝিনুক মূল বিষয়টা জানতে চেয়েছিল, ওঁর বাড়িতে কী ধরনের রহস্যজনক ঘটনা ঘটছে?

"আমি একই প্রশ্ন করেছিলাম ওঁকে। কয়টাই স্বাভাবিক। ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, 'ব্যাপারটা ফোনে বললে আপনি ঠিকমতো বুঝতে পারবেন না। আমাদের এলাকায় এসে শুনলে এর গভীরতা বুঝতে পারবেন।' তখন আমি বলেছিলাম, 'কেসটা আমার অপছন্দ হলে আমি তো তদন্তে রাজি হব না।' সঙ্গে-সঙ্গে উনি বললেন, 'সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আসাটা বৃথা যাবে না। মোগলমারির মহাবিহারটা দেখে যেতে পারবেন। আশপাশে আরও বেশ ক'টা ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে, যা অবশ্যই দেখার মতো। আপনার আসা-যাওয়া, থাকার দায়িত্ব আমার। এখানে আসার জন্য যা ফিজ চাইবেন, তাও দেব।' এ কথা শোনার পর আর না করিনি," একটু থেমে দীপকাকু ফোর্ড বলে উঠেছিলেন, "গছাড়াও ওই যে বললেন ওঁর ওখানে গিয়ে ঘটনাটা শুনলে সমস্যার গভীরতাটা বুঝতে পারব, এই পয়েন্টটাও আমাকে টানছে।"

"ভালই তো, ঘুরে এসো। অনেকদিন বাইরে কোথাও যাওনি। তোমার বেশির ভাগ কেস তো কলকাতা ঘিরে। ঝিনুকের যখন পড়ার চাপ নেই, তোমার সঙ্গে গেলে একটা এডুকেশনাল ট্রিপ হয়ে যাবে," বলেছিলেন বাবা। ঝিনুক দীপকাকুর অভিযানে সঙ্গী হোক, বাবা সব সময় চান। সন্তান মেয়ে বলে নিরাপদ জীবন বেছে নিক, এটা মেনে নিতে পারেন না। নিজে এয়ারফোর্সে ছিলেন। সাহসের আর-এক নাম যে রোমাঞ্চ, এ ব্যাপারে তাঁর অটুট বিশ্বাস।

বাবার বলা শেষ হতেই মা ঢুকেছিলেন ঘরে। হাতের ট্রেতে সকলের জন্য স্পেশাল ব্রেকফাস্ট। স্পেশালের কারণ দীপকাকু। উনি মায়ের রান্নার বেজায় ভক্ত। বাবার কথার সূত্র ধরে মা জানতে চেয়েছিলেন, "কোথায় যাবে ঝিনুক?"

দীপকাকু সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাপারটা বললেন। উৎকণ্ঠার গলায় মা জানতে চান, "কেসটা যদি তোমার পছন্দ, হয়, সলভ করতে যতদিন লাগবে, ঝিনুক কি ততদিন ওখানেই থাকবে? কলেজ কামাই হবে ওর। লেখাপড়ার ক্ষতি হবে।"

দীপকাকুকে কিছু বলতে না দিয়ে উত্তর দিলেন বাবা। বলেছিলেন, "কেস যতই জটিল হোক, নিষ্পত্তি করতে এক সপ্তাহের বেশি লাগে না দীপঙ্করের। এবার যদি সময় বেশি লাগে, দীপঙ্কর ঝিনুককে ফেরত পাঠাবে এক সপ্তাহের মাথায়। এমনিতে তো অ্যাসিস্ট্যান্ড ছাড়াই ইনভেস্টিগেট করে দীপঙ্কর। ঝিনুকের এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে বলেই মাঝে-মাঝে ডেকে নেয়।"

বাবার কথায় মোটেই আশ্বস্ত হননি মা। গুম মেরে গিয়েছিলেন। দীপকাকুর অনেক কেসে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ছিল ঝিনুক। তবু মায়ের ভয় কাটেনি। রহস্য তদন্তের কাজে অনেক ঝুঁকি থাকে যে। গত কেসটাতেই হাতে পিস্তল ধরতে হয়েছিল ঝিনুককে, চালাতে অবশ্য হয়নি।

বাবার সঙ্গে দাবা আড্ডা সেরে দীপকাকু যখন ফিরে যাচ্ছেন, ঝিনুককে বলেছিলেন, "পরে ফোনে জানাচ্ছি পরশু ক'টায় আমাদের বেরতে হবে।"

গতকাল বিকেলে দীপকাকুর ফোন এসেছিল। জানালেন, "কাল সকাল ছ'টায় বৌলি এক্সপ্রেসের রিজার্ভ টিকিট পাঠিয়েছে ক্লায়েন্ট। ভোর পাঁচটায় ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছব তোমাদের বাড়িতে, রেডি থেকো। একদম দেরি করা যাবে না।"

কোথাও এতটুকু লেট হয়নি। সকাল ন'টার আগেই ঝিনুকরা মোগলমারির কাছাকাছি। এত অল্প সময়ের জার্নিতেই প্রকৃতি কতটা বদলে গিয়েছে! শহরে বসে কথায়-কথায় যারা 'বোর হচ্ছি,' 'বোর লাগছে,' বলে, এরকম শর্ট ডিসট্যান্স ট্যুরে বেরিয়ে পড়তেই পারে।

গাড়ি হাইওয়েতে উঠে পড়ল। দীপকাকু ঘাড় ফিরিয়ে ঝিনুককে বললেন, "এই হল হাইওয়ে। কত চওড়া আর ঝকঝকে দেখছ!"

"এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ষাট, আর-একটু এগোলেই ওড়িশা, এন এইচ ১৬। দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত গিয়েছে রাস্তাটা। সামনের বড় শহর জলেশ্বর," বলল ঝিনুক।

নীচের ঠোঁট উলটে বিস্ময় আর প্রশংসাসূচক মাথা নাড়লেন দীপকাকু। বললেন, "বাহ! হোমওয়ার্ক করেছ ভালমতোই। গোয়েন্দাগিরির কাজে এটা খুব দরকার।"

লজ্জা পেয়ে জানলার দিকে মুখ ফেরায় ঝিনুক। গাড়ি এবার হাইওয়ে ছেড়ে গ্রামের সুরকির রাস্তা ধরল।

ঝিনুক আর দীপকাকু এখন ডাঃ সুশোভন বসুর ড্রয়িংরুমে। দোতলা এই বাড়ির বিশাল গেটের সামনে এসে গাড়ির হর্ন বাজিয়েছিলেন শ্যামল বারিক। দরোয়ান শ্রেণির একজন এসে গেট খুলে দিয়েছিল। গাড়ি এসে পৌঁছেছিল বড়সড় সদর দরজার সামনে। পাল্লা সামান্য খোলা। শ্যামলবাবু গাড়ি থেকে নেমে ওই দরজা ঠেলে ঝিনুকদের ড্রয়িংরুমে এনে বসিয়েছেন। বলেছেন, "আপনারা বসুন। ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গিয়েছেন, এখনই আসবেন। আমি ততক্ষণ দরজার সামনে থেকে গাড়িটা সরিয়ে রাখি।"

সেই যে গিয়েছেন বারিকবাবু, পাঁচ-সাত মিনিট হতে চলল ঘরে কেউ এসে পৌঁছয়নি। ড্রয়িংরুমটা দেখনদারির মতো সাজানো নয়, তবে বেশ ছিমছাম। দীপকাকু একফাঁকে সোফা থেকে উঠে গিয়ে কাচের পাল্লার আলমারির বইগুলো দেখে এসেছেন। তারপর থেকে বসে রয়েছেন দৃষ্টি শূন্যে ভাসিয়ে। দীপকাকু এই ভঙ্গিতে ঘণ্টার পর-

boiRboi.blogspot.com

ঘণ্টাও কাটিয়ে দিতে পারেন। যেন ধ্যান করছেন চোখ খোলা রেখে। ভিতর বাড়ি থেকে কারও গলার শব্দ বা কোনও কিছুর আওয়াজও ভেসে আসছে না। সময় থমকে যাওয়া এরকম সিচুয়েশন মোটে সহ্য হয় না বিনুকর। একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে রয়েছে মাথায়, ভেবেছিল পরে একান্তে জিজ্ঞেস করবে দীপকাকুকে। সময় ভরাট করতে এখনই সেই কথাটা তোলে, "আচ্ছা, স্টেশনে আমাদের নিতে এসে বারিকবাবু এক চান্সে আমাকে চিনে ফেললেও, আপনাকে পারেননি। আমার থেকে সামান্য দূরেই আপনি ছিলেন। এরকমটা কেন হল?"

"কারণ হিসেবে তোমার কী মনে হচ্ছে?" পালটা জানতে চাইলেন দীপকাকু।

বিনুক বলল, "মনে হচ্ছে আমার ফেসবুক প্রোফাইল দেখেছেন ভদ্রলোক। তাই চট করে চিনে ফেলেছেন। আমার ভাল নাম জেনেছেন ওখান থেকেই। আপনার তো ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট নেই। এমনকী, আমার পোস্ট করা ফোটোগুলোতেও আপনাকে পাওয়া যাবে না। কেন না আপনিই বারণ করেছেন ফোটো দিতে, তাই চিনে উঠতে পারেননি আপনাকে। বারিকবাবুর এধরনের কৌতূহল আমার কিন্তু ঠিক সুবিধের ঠেকছে না।"

"এর চেয়েও সহজে তোমাকে চেনার উপায় আছে। ট্রেনের রিক্লাভেঁশন করেছে এরা। যার মেসেজ আমার ফোনে ছিল। আমাদের নাম-বয়স আমিই পাঠিয়েছি ক্লায়েন্টকে। শ্যামল বারিক যখন নিতে এলেন আমাদের, স্টেশনের সামনে তোমার বয়সি শহুরে মেয়ে একটাই। আমার বয়সের পুরুষ অনেক। তাই তোমাকে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি।"

মনে-মনে জিভ কাটে বিনুক, একটু বেশিই ভাবা হয়ে গিয়েছে তার। টিকিটের ব্যাপারটা খেয়াল রাখা উচিত ছিল। ভিতর বাড়ির দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ, সরে গেল পরদা। লৌজনোর হাসি সমেত ঘরে ঢুকলেন বছরপঞ্চাশের এক ভদ্রলোক। বিনুকরা উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'হাত জড়ো করে ভদ্রলোক বললেন, "আমিই সুশোভন বসু।"

দীপকাকু প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বসলেন সোফায়, বিনুকও বসল। মুখোমুখি সোফাটায় বসে সুশোভন বললেন, "আপনাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল বলে দুঃখিত। আসলে বাবার শরীরটা কেমন আছে দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। আপনার সঙ্গে কথা বলাতে হবে তো, বলার অবস্থায় আছেন কিনা বুঝে এলাম।"

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না বিনুকের। দীপকাকুও বোঝেননি। জানতে চাইলেন, "আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলাতে হবে কেন?"

"গোটা সমস্যাটা তো ওকে নিয়েই," বলার পরই সুশোভনবাবুর দৃষ্টি থমকাল মাঝের নিচু সেন্টার টেবিলে। বলে উঠলেন, "সে কী, এখনও জলখাবার দেয়নি আপনাদের। আমি যে বলে রেখেছিলাম।"

কথা শেষ করে ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁক পাড়তে যাচ্ছিলেন সুশোভনবাবু, দীপকাকু বলে উঠলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। টেনে অল্প কিছু খেয়েছি আমরা। সমস্যাটা বলতে থাকুন।"

মনে-মনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বলা শুরু করলেন, "আমার বাবা শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার বসু ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন খড়গপুর কলেজের। রিটায়ার করেছেন ২০০০ সালে। তারপরও লেখাপড়া, গবেষণার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। ইতিহাস ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বিশেষ করে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগ নিয়ে আগ্রহ ছিল বেশি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের প্রায় গোটা গ্রামটাই দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রত্নক্ষেত্রের উপর। এটা একটা আর্কিয়োলজিকাল সাইট।"

"হ্যাঁ, জানি, তবে বিশদে জানি না," বললেন দীপকাকু।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমিও খুব ডিটেলে কিছু জানি না। আগ্রহ হয়নি। বাবা জানতেন। আর জানেন বাবার বন্ধু বিষ্ণু মাইতি। মানে বিষ্ণুকাকা।"

"এক মিনিট," বলে সুশোভনবাবুকে থামালেন দীপকাকু। বলতে থাকলেন, "বাবার সম্বন্ধে যখনই কিছু বলছেন, অতীতকাল ব্যবহার করছেন। ওঁর অসুস্থতা ঠিক কীরকম পর্যায়ে? কোনও ধরনের কাজই কি আর করতে পারছেন না?"

"ঠিক তাই। মাসচারেক হল তিনি ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। স্মৃতি লোপ পাচ্ছে ক্রমশ। পারম্পর্যহীন কথাবার্তা বলছেন। আমি ডাক্তার বলে রোগটা গোড়াতেই ধরে ফেলেছিলাম। ডিমেনশিয়া পুরোপুরি নিরাময়ের ওষুধ আজও বেরয়নি। সাপোর্টিভ কিছু মেডিসিন দিয়ে রোগটাকে সাময়িকভাবে কন্ট্রোল করা যায়। আমি তেমনটাই করছি," বলে দম নিতে থামলেন সুশোভনবাবু।

দীপকাকু বলে উঠলেন, "আপনার বাবা জরুরি কোনও স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন, তাই কি আমায় ডেকে পাঠালেন? সেই কারণেই সম্ভবত বাবার সঙ্গে কথা বলাতে চান।"

"না, ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ সরল নয়," চিন্তিত গলায় কথা শেষ করে ফের কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু, দু'জন কাজের লোক ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "নিন, খেয়ে নিন। তারপর কথা হবে খন।"

ধোঁয়া ওঠা ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, আলুর সাদা তরকারি, দু'প্রকার মিষ্টি, এই হল আইটেম। দেখেই খিদে চাগাড় মারল বিনুকের। খাবার দেওয়া হয়েছে দু'জনের জন্য। কাজের লোক দু'টি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। বিনুক ডাক্তারবাবুর উদ্দেশে বলল, "আপনি খাবেন না?"

"আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ব্রেকফাস্টের পক্ষে সময়টা তো যথেষ্ট লেট।"

লুচি-বেগুন ভাজা মুখে পুরে ফেলেছেন দীপকাকু। ওই অবস্থাতেই বলেন, "আপনি বলতে থাকুন।"

বিনুকও প্লেট থেকে খাবার তুলল। কথা শুরু করলেন ডাক্তারবাবু, "তো যা বলছিলাম, বাবা এবং বিষ্ণুকাকার ইতিহাসচর্চাটার উৎস কিন্তু এই গ্রামটাই। ছোট থেকে দেখেছেন কোনও কাজে মাটি খুঁড়তে গিয়ে গ্রামবাসীরা হামেশাই প্রত্ননিদর্শন পাচ্ছে। পাঁচশো, হাজার বছরের পোড়ামাটির প্রত্নবস্তুগুলোর গুরুত্ব না বুঝে কেউ নষ্ট করেছে, কেউ আবার সংসারের সাধারণ কাজে লাগিয়েছে। অনেকে আবার সংগ্রহ করেছে বুদ্ধি-বিবেচনা বোধ থেকে। তবে সোনাদানা যে যা পেয়েছে, চুপিচুপি বিক্রি করে দিয়েছে। এখানকার অনেক বাড়িতেই কিছু না-কিছু প্রত্ননিদর্শন পাবেন।"

"কিন্তু সেটা তো বেআইনি। প্রত্নবস্তুর অধিকার সরকারের। কেউই সেটা নিজের সম্পত্তি করে রাখতে পারে না," বললেন দীপকাকু। ওঁর খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। বিনুক অর্ধেকও শেষ করতে পারেনি। মন দিয়ে সুশোভনবাবুর কথা শুনছে। দীপকাকুর কথার উত্তরে সুশোভনবাবু বলতে থাকলেন, "এ গ্রামের খবর সরকারের কানে পৌঁছেছে, খুব বেশি বছর হয়নি। সরকারি নিয়মকানুনে নানা জটিলতা। তাই কাজেও ঢিলেমি। প্রকৃত উদ্যোগ নিয়ে সরকার যদি প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ করতে নামে, গ্রামের লোকেরা তাদের কাছে থাকা জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেবে। বেশির ভাগই তো পোড়ামাটি কিংবা পাথরের বস্তু। কিছু তামা-ব্রোঞ্জের টুকরো-টাকরা জিনিসও আছে। তবে সোনা থাকলে নিশ্চয়ই ফেরাবে না।"

ভিতর দরজার পরদা সরে গেল। কাজের লোক ট্রে-র উপর দুটো কাপ নিয়ে ঢুকল ঘরে। বিনুক আর দীপকাকুর সামনে কাপ রাখতে যাচ্ছে, সুশোভন বললেন, "আমাকেও চা দিস তো রবি।"

বিনুক বলল, "আমি তো চা খাই না। আপনি এখান থেকেই একটা কাপ নিতে পারেন।"

"তা হলে তুমি কী খাবে? কফি চলবে?" জিজ্ঞেস করলেন সুশোভনবাবু।

বিনুক বলল, "কিছু না হলেও চলবে।"

কথা শুনলেন না সুশোভনবাবু। কাজের লোককে বললেন, "এক

boiRboi.blogspot.com

কাপ কফি আনিস তো রবি।"

ঘাড় নেড়ে ঘর ছাড়ল লোকটি। কাপ তুলে চায়ে চুমুক দিয়ে সুশোভন প্রসন্নে ফিরলেন। বললেন, "বাবা এবং বিষ্ণুকাকা কলেজে পড়াকালীন গ্রামের লোকজনকে বোঝাতে শুরু করেন প্রত্নবস্তুগুলোর গুরুত্ব। নিজেরাও গোটা এলাকা ঘুরে সন্ধান করতেন পুরাসম্ভার। কখনও কোনও আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে হয়তো দেখলেন গাছতলায় ভাঙা শিলা বা মাকড়া পাথরের মূর্তি রাখা আছে, ফুল এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সেটার পুজো করা হচ্ছে। মাটি কাটতে গিয়ে সেসব জিনিস পেয়েছে তারা। বাবা, বিষ্ণুকাকা তাঁদের বললেন, 'মূর্তি খোলা জায়গায় রেখো না। চুরি হয়ে যাবে।'

"হয়েছে চুরি?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সুশোভনবাবু বললেন, "গত বিশ বছরে দুটো চুরির খবর শুনেছি। খুব একটা হইচই হয়নি। কারণ, যার চুরি হয়েছে, সে নিজেই তো জিনিসটার মূল্য বোঝে না।"

কাজের লোক রবি ঝিনুকের জন্য কফি নিয়ে এল। ঝিনুক কফি মগ হাতে নেয়। একটু আগে কোনওক্রমে নিজের প্লেট শেষ করেছিল। রবি খাবার প্লেট, দীপকাকুদের শূন্য চায়ের কাপ দুটো গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল।

খাবার দেওয়ার সময় টিসু পেপার ভর্তি স্ট্যান্ড দিয়ে গিয়েছিল কাজের লোক। একটা পেপার তুলে মুখ-হাত মুছলেন দীপকাকু। ফের বলা শুরু করলেন সুশোভন, "এখন যেখানে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে সরকারি তত্ত্বাবধানে, আগে প্রায় মাঠসমান একটা ঢিবি ছিল। এলাকাবাসী বলত সখিসেনা বা সখিসেনার পাঠশালা।"

"সখিসেনা-অহিমানিকের করুণ কাহিনি তো?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

প্রশংসায় উজ্জ্বল হল ডাক্তারবাবুর চোখ। বললেন, "বাহ, আপনি এখানকার ব্যাপারে লেখাপড়া করেছেন তার মানে।"

"খুব বেশি নয়, আপনার সঙ্গে দেখা করতে হবে জেনে যতটুকু পেরেছি..." দীপকাকুর কথা শেষ হতেই বলা শুরু করলেন সুশোভনবাবু, "সখিসেনার পাঠশালা ছাড়াও আমাদের গ্রামের এক বাস্তু জমির সামনে তিনটি বিশাল স্তম্ভের কাঠামো দেখে বাবা এবং বিষ্ণুকাকা অনুমান করেন এগুলো স্টাকচারাল মাউন্ড, অর্থাৎ এর নীচে সুপ্রাচীন কোনও স্থাপত্য ও জনপদের নিদর্শন আছে। কলকাতায় পুরাতত্ত্ববিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বাবা, বিষ্ণুকাকা এবং গ্রামের আরও কিছু শিক্ষিত লোকজন। গ্রামে দু'-তিনজন পুরাতাত্ত্বিক ঘুরেও যান। তাঁরাও সহমত পোষণ করেন বাবাদের বক্তব্যের। কিন্তু অনুমানকে তো প্রমাণ করতে হবে। সেই কাজটা সরকারি সিলমোহর ছাড়া করা যায় না। আইন নেই। প্রত্নবস্তুর জন্য বাবারা তদ্বির শুরু করেন সরকারের কাছে।"

বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে কথা থামালেন সুশোভনবাবু। ঝিনুক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে শ্যামল বারিক ঘরে ঢুকেছেন। ডাক্তারবাবুকে বললেন, "মনোহরপুর থেকে কল এসেছে।"

"সিরিয়াস অভিশন?" জানতে চাইলেন সুশোভন।

বারিক বললেন, "না। তেমন সিরিয়াস নয়। বয়স্ক পেশেন্ট, বিছানায় শোয়া। চেম্বারে আনতে পারবে না।"

"তা হলে বলে দাও ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে যাচ্ছি।"

ডাক্তারবাবুর নির্দেশ শুনে ঘাড় কাত করলেন বারিক। পরদা সরিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দীপকাকুও শ্যামল বারিককে দেখছিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার চেম্বার কি এই বাড়িতেই?"

"না, বাড়ির গায়েই। সারাক্ষণ বাড়িতে পেশেন্ট, পেশেন্ট পার্টি, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের আনাগোনা চলুক, বাবা চাননি, আমিও বাবার সঙ্গে একমত ছিলাম। আমার এম বি বি এস শেষ হওয়ার আগেই বাবা বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে আমার জন্য চেম্বার-ঘর বানিয়ে রাখেন।"

"আপনি কি ওখানে দু'বেলাই বসেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

ডাক্তারবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তবে সন্ধের দিকে দাঁতন শহরের একটা নার্সিংহোমেও যাই। আপনারা আসছেন বলে আজ সকালে চেম্বারে বসব না, বলা ছিল শ্যামলকে। চেম্বারে বসে সে কথাই পেশেন্ট পার্টিদের বলছে এখন। সাধারণ অসুখের ওষুধও বিক্রি করছে। এই গ্রামে আলাদা করে ওষুধের দোকান নেই, ডাক্তারের কাছ থেকেই লোকে কেনে। কল এসেছিল বলেই শ্যামল জানতে এল, যাব কি না। কলের ব্যাপারে তো কিছু বলে রাখিনি।"

থেমে গিয়ে ডাক্তারবাবু ফের বলে উঠলেন, "সে থাক গে, এবার আসল কথায় ফিরি। আমাদের সমস্যার সূত্রপাত ২০০১ সালে। সরকারের পক্ষ থেকে তখন শুরু হয়নি সখিসেনার ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি। শীতের এক বিকেলে বাবা আর বিষ্ণুকাকা এই ঘরটায় বসে নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সনাতন বেরা এসে পৌঁছয়। গামছায় এনেছে বেশ ক'টা পোড়ামাটির প্রাচীন উৎসর্গ ফলক। ততদিনে গ্রামের শিক্ষিত মানুষজন উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন কলকাতার বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে জেনেছেন, সেগুলো প্রাক-ইসলামিক যুগের। সখিসেনার স্টাকচারাল মাউন্ডটার নীচে সম্ভবত কোনও বৌদ্ধবিহার আছে। সনাতন এনেছিল সেই ফলক যা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করা হত। ফলকগুলো সনাতন বেরা পায় নিজের ভিটেতে, নতুন একটা ঘর তোলার জন্য ভিত খুঁড়তে গিয়ে। বাবারা যেহেতু এ সব ব্যাপারে কাজ করছেন, তাই দেখাতে নিয়ে এসেছিল সে। বিষ্ণুকাকা, বাবা তো অবাক। এক জায়গায় এত ফলক একসঙ্গে পাওয়া গেল কী করে? নীচে কি কোনও বৌদ্ধস্তূপ আছে? বাবারা তখনই সনাতন বেরাকে নিয়ে রওনা দিলেন অকুস্থলে। দু'জন মজুর তখনও ভিত খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কাজ বন্ধ রাখতে বলেন বাবা, বিষ্ণুকাকা। বাড়ির ভিতের জন্য যেভাবে খোঁড়াখুঁড়ি হয়, তাতে মাটির নীচে থাকা গোটা প্রত্নবস্তু ভেঙে যেতে পারে। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে উৎখননযোগ্য অ্যাপারেটাস সঙ্গে নিয়েছিলেন বাবা! দুই বন্ধু মিলে সেই জিনিসগুলোর সাহায্য খোঁড়া জায়গায় নতুন করে সন্ধান চালাতে থাকেন। সঙ্গে ছিল শুধু সনাতন বেরা। দু'জন মজুর বাড়ি চলে গিয়েছিল। চারপাশে তখন সন্ধে নেমে গিয়েছে। বাবা আর বিষ্ণুকাকার একসঙ্গে কাটানো শেষ সন্ধে ছিল সেটা।"

"মানে?" বলে উঠলেন দীপকাকু।

সুশোভনবাবু খানিক বিষণ্ণ গলায় বললেন, "দু'জনের মধ্যে আজীবনের জন্য ঝগড়া হয়ে গেল।"

"কারণ?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

একটু সময় নিয়ে সুশোভনবাবু বলতে থাকলেন, "ঝগড়াটা নাকি সনাতন বেরার ভিটেতেই শুরু হয়েছিল। বাবা বাড়ি ফিরে আমাদের কিছু বলেননি। সেদিন ভারাক্রান্ত মনেই বাড়ি ফিরেছিলেন বাবা। রাতে খাওয়াদাওয়াও করেননি। পরে গ্রামের লোকের মুখে শুনলাম বিষ্ণুকাকা নাকি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন বাবা সনাতন বেরার ভিটেতে বেশ ক'টা সোনার মুদ্রা পেয়েছেন এবং সেটা স্বীকার করছেন না।"

"এটা তো বিরাট অ্যালিগেশন! তারপর?"

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তারবাবু বললেন, "তারপর যেটা করার, সেটাই করেছি। বাবাকে এসে বললাম অপবাদটার কথা। গ্রামের লোকের কাছে এটা শোনার পর থেকে নিজেকেও ভীষণ অপমানিত লাগছিল।"

কৌতূহল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে ঝিনুকের, দীপকাকু জিজ্ঞেস করার আগেই নিজে জানতে চাইল, "আপনার বাবা কী বললেন?"

"বাবা স্বীকার করলেন আগের সন্ধেয় কাজের ঝগড়ার কথা। বললেন, 'বিষ্ণু কী দেখতে কী যে দেখল! কাজ চলাকালীন হঠাৎ আমার কাছে

দৌড়ে এসে বলল, 'দেখি-দেখি, কোথায় রাখলি কয়েনগুলো?' আমি বললাম 'কীসের কয়েন? কোন কয়েন, কী উলটোপালট বলছিস তুই?' ও বলল 'আমি এইমাত্র তোর হাতে পাঁচ-ছ'টা কয়েন দেখলাম। কোথায় লুকোলি?' বললাম, 'আমাকে সার্চ কর। কোথায় লুকিয়েছি দেখ।' ও আমার জামা-প্যান্টের পকেট, খোঁড়ার যন্ত্রপাতির থলে সার্চ করল। পেল না। বলতে লাগল, 'আমি একেবারে স্পষ্ট দেখেছি তোর হাতে কয়েন। আবার মাটিতেই লুকিয়ে রাখলি নাকি?' বলেছিলাম, 'খুঁজে দেখ।' যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই এরিয়া ঘিরে পাগলের মতো খুঁজল। আলো কমে গিয়েছে বলে সনাতনকে বলল টর্চ আনতে। নিজের ঘর থেকে নিয়ে এল সনাতন। অনেক খুঁজেও কিছু পেল না। তারপর আমাকে যা নয়, তাই বলতে-বলতে ফিরে গেল।' বাবার কাছে এত দূর শুনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বিষ্ণুকাকা হঠাৎ এরকম করলেন কেন?' বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওর চোখের ভুল অথবা মনের।' ''

''মনের ভুলটা ঠিক বুঝলাম না,'' বললেন দীপকাকু।

ডাক্তারবাবু বললেন, ''প্রথমটায় আমিও বুঝিনি। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মনের ভুল কেন হবে? বিষ্ণুকাকা তো মানসিকভাবে যথেষ্ট সুস্থ।' বাবা বলেছিলেন, 'এখন আর সুস্থ নয়। এতদিন ধরে মোগলমারির উপরে কাজ করছে, সেরকম স্বীকৃতি তো কিছু পায়নি, আবিষ্কারক হওয়ার নেশা পেয়ে বসেছে। ছোটখাট জিনিস পেলেই মনে করছে বিরাট কিছু পাওয়া গেল। মানে রজ্জুতে সর্পভ্রম আর কী।' ''

''দু'জন মিলে যখন কাজ করছেন, আবিষ্কারক হিসেবে দু'জনেরই নাম থাকবে। বিষ্ণুবাবু ভাবলেন কেন, আপনার বাবা মুদ্রাগুলো লুকিয়ে ফেলেছেন?'' প্রশ্ন রাখলেন দীপকাকু।

উত্তরে সুশোভন বললেন, ''বিষ্ণুকাকারও হয়তো মনে হয়েছে আবিষ্কারক হিসেবে বাবা একার নাম চান। তবে একটা তিনি গ্রামবাসীদের বলেননি। যাদের তেমন লেখাপড়া নেই, তারা তো আবিষ্কারকের গুরুত্ব বুঝবে না। বিষ্ণুকাকা সবাইকে বলতে থাকেন, প্রবোধ মুদ্রাগুলো বেচে দেবে। বাজারে ওই সব মুদ্রার অনেক দাম!''

''গ্রামের লোকের কী রিঅ্যাকশন ছিল?'' জানতে চাইলেন দীপকাকু।

ডাক্তারবাবু বললেন, ''প্রথমটায় বিষয়টা নিয়ে একটু ফিসফাস, কানাকানি হয়েছিল বটে। অ্যালটিমেটলি বিষ্ণুকাকার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি।''

''কেন করেনি? বিশেষ কোনও কারণ?'' প্রশ্ন রাখলেন দীপকাকু।

কারণ একটাই, গ্রামের মানুষ বাবাকে ভীষণ বিশ্বাস করে। এটা তিনি অর্জন করেছেন। লোকের আপদে-বিপদে না ডাকতেই পৌঁছে যেতেন বাবা। গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সজাগ নজর তাঁর। দরকারে আর্থিক সাহায্য করতেন। মোগলমারির প্রত্নগুরুত্ব আবিষ্কারের জন্য বাবা হিল্লিদিল্লি কোথায় না গিয়েছেন! সেই লোক কি না ক'টা মুদ্রা চুরি করে বড়লোক হবে, এটা গ্রামের সাধারণ মানুষ মেনে উঠতে পারেনি। আর আমাদের পরিবার বরাবরই সচ্ছল, প্রচুর জমিজিরেত আছে। অধ্যাপক হিসেবে বাবার বেতনও খারাপ ছিল না।''

সুশোভনবাবু বলা শেষ করতেই দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, ''বিষ্ণুবাবুর পেশা কী?''

''শিক্ষকতা। আমাদের গ্রামের হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। আমিও ওই স্কুলে পড়েছি। রিটায়ার করার পর বাড়িতে টিউশন পড়িয়েছেন অনেকদিন। ইদানীং আর পারেন না। বয়স হয়েছে। বার্ধক্যজনিত রোগে কাতর অবস্থা। সেই বিষ্ণুকাকাই এখন হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।''

''বুঝলাম না,'' অবাক গলায় বলে ওঠেন দীপকাকু। বিনুকও ডাক্তারবাবুর কথাটা বুঝতে পারেনি।

উনি বলতে থাকেন, ''আজ থেকে বছরপনেরো-ষোলো আগে বিষ্ণুকাকা যে অভিযোগ এনেছিলেন, সেটাই আরও বড় করে বাবা নিজের মুখে স্বীকার করলেন এখন। অবশ্যই সেটা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত রোগীর কথাবার্তা ক্রমশ এলোমেলো হতে থাকে। কখন বলার ইচ্ছে হয় পায়। বেশ কিছুদিন যাবৎ বাবা আমাকে সামনে পেলে মাঝে-মাঝে বলে উঠছেন, 'চারঘড়া মোহর! কেউ জানতে না পারে! সাবধান!''

কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ঝিনুকের বুকটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। চারঘড়া মোহর মানে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! এবাড়ির ভিতরেই কোথাও লুকনো আছে কি? দীপকাকুর কোনও হেলেলা নেই। স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ''কথাটা উনি কেন শুধু আপনাকেই বলছেন?''

''যেহেতু ওঁর পর আমিই এবাড়ির সবার বড়। আমার একটি ভাই এবং বোন আছে। ভাই চাকরিসূত্রে সুদূরেই, পরিবার আছে এখানে। বোনের বিয়ে হয়েছে কলকাতায়,'' বললেন সুশোভন।

একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বললেন, ''তার মানে যা দাঁড়াল, উনি আপনাকে সতর্ক করছেন চারঘড়া মোহরের ব্যাপারে। যা হয়তো লুকিয়ে রেখেছেন কোথাও, সম্ভবত এ বাড়িতেই।''

''আমার তো মনে হয় প্রলাপ বকছেন। যা এই রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ। চারঘড়া মোহর, এসব পুরনোদিনের গল্পকথায় শোনা যায়। বাস্তবে হয় কি?

ডাক্তারবাবুর কথার উত্তরে দীপকাকু বলেন, ''আপনার বাবা কিন্তু পুরনো দিন নিয়েই কাজ করতেন। প্রাচীন ইতিহাস।''

চুপ করে রইলেন সুশোভন। কপালে ভাঁজ পড়েছে। বলে উঠলেন, ''আমি অবশ্য এতটা তলিয়ে ভাবিনি। এদিকে মুশকিল হয়েছে অন্য জায়গায়। কথাটা উনি আমার উদ্দেশে বললেও খেয়াল করছেন না আশপাশে কেউ আছে কিনা। ওঁর রোগের কারণে এটা ঘটছে, ফলে এবাড়ির সদস্য এবং কাজের লোকেদের কানে গিয়েছে খবরটা। এদের মাধ্যমে ঘটনাটা বাইরে চাউর হয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুকাকা এখন পূর্ণ উদ্যমে বলতে শুরু করেছেন, 'কী, মিলল তো আমার কথা? প্রবোধ সেদিন মোহরগুলো নির্ঘাত ঘড়া থেকেই তুলেছিল। তখনকার মতো রেখে দিয়েছে। পরে সময় সুযোগ বুঝে তুলে নিয়ে গিয়েছে ঘড়াগুলো। এতদিন চেপে রেখেছিল সব কিছু। মাথাটা খারাপ হয়ে যেতেই পেটের কথা মুখে চলে এসেছে।' ''

সুশোভনবাবুর বলা শেষ হতেই দীপকাকু জানতে চাইলেন, ''গ্রামের লোকজনের কী ধারণা? তারাও কি এবার বিশ্বাস করছে চারঘড়া মোহর লুকিয়ে রেখেছেন আপনার বাবা? যেহেতু উনি নিজের মুখে একথা বলছেন।''

''বিষ্ণুকাকা ছাড়া গ্রামের প্রায় সবাই বলাবলি করছে মাথাটা গিয়েছে বাবার। যে কথা বলছেন, আসলে তা প্রলাপ। অনেকেই তো বাবার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে গিয়েছে। যা বুঝেছে, বলেছে অন্যদের। কিন্তু কিছু লোক কিংবা কোনও একজন ধরে নিয়েছে বাবা সত্যি কথাই বলছেন। ফলে খুব সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছি আমরা। এটার একটা সুরাহা করার জন্যই ডেকেছি আপনাকে,'' বলে থামলেন সুশোভন। দম নিয়ে ফের বলা শুরু করলেন, ''পাঁচদিন হল বাবাকে নিয়ে দিঘা গিয়েছিলাম। মানে সপরিবারে। কাছাকাছি বিশ্রাম ও বেড়ানোর জায়গা বলতে ওটাই। সমুদ্রের ধারে গেলে বাবা হয়তো একটু বেটার ফিল করবেন, সেই ভেবেই যাওয়া। বাবার অসুস্থতার কারণে বাড়ির সকলেই বেশ মনখারাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আউটিংটা দরকার হয়ে পড়েছিল। বাড়ি পাহারায় ছিল কাজের লোক রবি আর অনন্ত। প্ল্যান ছিল দিঘায় দু'রাত, তিনদিন থাকব। একটা রাত কাটার পরই রবির ফোন। ভীষণ ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলেছিল, 'বাবু, আজ সকালে উঠে দেখি পিছনের বাগানে অনেকটা জায়গা জুড়ে কোপানো। কারা যে কোপাল রাতে, আমরা এতটুকু টের

boiRboi.blogspot.com

পাইনি।' দিঘা থেকে ফিরে এলাম সকলে। দেখলাম বাগানের বিভিন্ন জায়গায় মাটি খোঁড়া হয়েছে। এর পর আর দেরি করিনি। কলকাতার এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করলাম একজন ভাল গোয়েন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য। সে আপনার কথা বলল।''

''কারা বাগান খুঁড়ল, এটা হদিশ করার ব্যাপারে এখানকার থানাই তো যথেষ্ট। আপনি গোয়েন্দার প্রয়োজন বোধ করলেন কেন?'' জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

ডাক্তারবাবু বললেন, ''বাগান খোঁড়ার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো শুনলেন। গ্রামের কেউ বা কয়েকজন মনে করছে চারঘড়া মোহর আমাদের বাড়িতেই কোথাও পোঁতা আছে। এবার বাগান খুঁড়েছে, পরের বার সুযোগ পেলে বাড়ির মেঝে খুঁড়বে। চারঘড়া মোহর মানে তো কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার। তার জন্য মরিয়া হয়ে আরও কত কী ক্ষতি করবে, কে জানে! কী করতে পারে, তা নিয়ে তো পুলিশ মাথা ঘামাবে না। আপাতত বাগান কারা খুঁড়েছে এটা জানার জন্য গ্রামের কিছু মজুর, আমরা বলি পালামি, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে চাপ দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করবে।''

''তাতে অসুবিধে কোথায়? এটাই তো সঠিক পদ্ধতি,'' বললেন দীপকাকু।

সুশোভন বললেন, ''আমার মন বলছে খোঁড়াখুঁড়ির মজুরগুলো আমাদের গ্রামের নয়। মজুরদের অন্য কোথাও থেকে আনা হয়েছে। কারণ আমাদের এলাকার ওই শ্রেণির মানুষ এই বাড়িটাকে শ্রদ্ধা-সমীহের চোখে দেখে। বাবা ওই গরিব মানুষগুলোর জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমিও বিনামূল্যে ওদের চিকিৎসা করি, ওষুধ দিই রিপ্রেজেন্টেটিভদের দিয়ে যাওয়া স্যাম্পেল থেকে। তা ছাড়া দুষ্কৃতী আর-এলাকা কারণেও এদের কাজে লাগাত না। এরা সহজ সরল মানুষ, পুলিশ চাপ দিলেই বলে দেবে, কে তাদের এসব করতে বলেছে।''

''অর্থাৎ দুষ্কৃতী এলাকার লোক হলেও, মজুরদের বাইরে থেকে আনা হয়েছে। এমনটাই আপনার ধারণা,'' বললেন দীপকাকু।

'হ্যাঁ' সূচক মাথা উপর-নীচ করেন সুশোভনবাবু। ঝিনুক বলে, ''দুষ্কৃতী এই গ্রামের কেউ, এটা কোন যুক্তিতে ধরে নেওয়া হচ্ছে?''

''চারঘড়া মোহরের কথা এলাকার দুষ্কৃতীদের কানে প্রথমে যাবে। তারা চুপচাপ বসে থাকবে, বাইরের ক্রিমিনালরা এসে বাগান খুঁড়বে, এটা হতে পারে না,'' বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক বুঝল প্রশ্নটা তড়িঘড়ি করা হয়ে গিয়েছে। আর-একটু তলিয়ে ভেবে করলে হত। ডাক্তারবাবু বলে ওঠেন, ''ক্রিমিনাল শুধু আমাদের এলাকার নয়। এ বাড়িতেও তার যাতায়াত আছে, এমনটাই এখন মনে হচ্ছে আমার।''

''কেন মনে হচ্ছে?'' জানতে চাইলেন দীপকাকু।

একটু ভেবে নিয়ে সুশোভন বলেন, ''বাবার রোগের তখন প্রথম দিক, নিজের স্টাডিতে ঢুকে প্রায়ই বলতেন, 'আমার জিনিসপত্রে কে হাত দিয়েছে? কে ঢুকেছিল ঘরে?' মাঝে-মাঝে স্টাডিতে বসে চেঁচিয়ে উঠতেন, 'কে? কে ওখানে?' বাড়ির কেউ গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করত, 'কী হল, কাকে দেখলে?' বলতেন, 'কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।' আমরা ভাবতাম দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে ওঁর। রোগটার উপসর্গ। একদিন স্টাডিতে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করলেন, 'দ্যাখো, দেখে যাও, কী অবস্থা করে রেখেছে।' আমার ছেলে দৌড়ে গিয়েছিল স্টাডিতে। দেখল, মেঝেয় পড়ে রয়েছে আলমারির বেশ কিছু বই-খাতা। তখনও আমরা ধরে নিয়েছিলাম বাবা বেভুল হয়ে নিজেই ওই কাজ করেছে। কিন্তু বাগান খোঁড়া হল দেখে মনে হচ্ছে বাবার কথার সারবত্তা ছিল। কেউ একজন বাবার স্টাডিতে মুল্যবান কিছুর হদিশ পাওয়া যায় কি না দেখত। যখন তার কানে এল চারঘড়া মোহরের তথ্যটা, বাগান খোঁড়ার প্ল্যান আঁটল সে।

দীপকাকুর চশমা নাকের ডগায় এসে পৌঁছেছে, হুঁশ নেই তাঁর। ডাক্তারবাবুর কথাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, ''চলুন, আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করি।''

''তার আগে একবার বাগানটা দেখে নিন। যেমনটা খুঁড়েছে, তেমনই রেখে দিয়েছি। আপনার যাতে তদন্ত করতে সুবিধে হয়,'' বললেন ডাক্তারবাবু।

''এটা খুব ভাল করেছেন। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত,'' বলে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু।

ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দা, তার নীচে বাঁধানো উঠোন পার হয়ে খিড়কির দরজার কাছাকাছি চলে এসেছে ঝিনুককা। আসার পথে বাড়ির করবেজনকে চোখে পড়ল। তারাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝিনুককে। সকলের চোখ-মুখে গম্ভীর ভাব। বাগান খোঁড়ার ঘটনা টা বাড়ির আবহাওয়া গমগমে করে রেখেছে।

খিড়কির দরজা ডিঙোতেই বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সিমেন্টের চাতাল। এক প্রান্তে তুলসীমঞ্চ। চাতালের মাথায় অ্যাসবেস্টোসের শেড। দীপকাকু বললেন, ''এখানে নিশ্চয়ই মহোৎসব হয়।''

চকিতে দীপকাকুর দিকে তাকালেন ডাক্তারবাবু। বলে উঠলেন, ''এই অনুমানটা আশা করি আপনার এখানে আসার আগে লেখাপড়ার ফল নয়। এদিকের কোনও গ্রামে কয়েকদিন থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বললেন।''

ঝিনুকের খেয়াল হয়, তাই তো। দীপকাকুর দেশের বাড়ি মেদিনীপুরেরই কোনও গ্রামে। এখানে আসার আগে কথাটা মাথায় আসেনি। চাতাল ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ডাক্তারবাবুর উদ্দেশে দীপকাকু বললেন, ''পূর্ব মেদিনীপুর কনকপুর গ্রামে আমার আদিবাড়ি। জন্ম, লেখাপড়া ওখানেই। তাই এখানকার কালচার সবই আমার জানা।''

''তা হলে তো আপনি আমার দেশের লোক। জেলারও বলা যায়। বেশিদিন হয়নি মেদিনীপুর পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ হয়েছে। আর কনকপুরও এখান থেকে বিশ কিলোমিটারের বেশি নয়,'' খুশির গলায় বলে উঠলেন সুশোভনবাবু। দূরের মানুষকে আপনজন বলে জানার আনন্দ! এদিকে একটা প্রশ্ন যে ঝিনুককে খোঁচাচ্ছে। বলেই ফেলে সেটা, ''মহোৎসব ব্যাপারটা ঠিক কী?''

চাতাল ছেড়ে বাগানে পা রাখতে-রাখতে ডাক্তারবাবু বললেন, ''মহোৎসব হচ্ছে অষ্টগ্রহর নাম-সংকীর্তন। ভোগপ্রসাদ খাওয়া। এখানকার চালু কথায় বলে মচ্ছব। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কাঠের গৌরাঙ্গ মূর্তিকে বাড়ি এনে পুজো করা হয়। প্রধানত বৈষ্ণবদের উৎসব এটা। এখন সবাই করে। খরচ সামলাতে পারে বর্ধিষ্ণুরাই। এক-দু'হাজার ভক্ত সমাগম হয়।''

''আপনার বাবা তার মানে বেশ ধার্মিক মানুষ,'' মন্তব্য করলেন দীপকাকু।

''বাবা নয়, মা। বাবার পুজোআচ্চা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই। মায়ের ছিল। বছরচারেক হল মারা গিয়েছেন। তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আর মহোৎসব হয় না,'' কথা শেষ করে পাঁচিল ধারে আঙুল তুললেন ডাক্তারবাবু। বললেন, ''ওই দেখুন, মাটি কোপানোর চিহ্ন!''

দীপকাকু তড়িৎপায়ে এগিয়ে গেলেন। ঝিনুকরা অনুসরণ করল।

খোঁড়াখুঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন দীপকাকু। গভীর মনোযোগে জায়গাটার উপর চোখ বোলাচ্ছেন। গোটা বাগানের একের ছয় অংশটুকুতে বিক্ষিপ্তভাবে খোঁড়া হয়েছে। দীপকাকু ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকলেন। ঝিনুকও দেখছে। কিছু গর্তের সামনে উবু হয়ে বসলেন দীপকাকু। এখন দাঁড়ানো অবস্থায় মাটির দিকে চোখ রেখে বললেন, ''ঘড়া তো পায়নি বলেই মনে হচ্ছে। বড় কোনও গর্ত নেই। অল্প খুঁড়ে খোঁজ চালিয়েছে।''

''আপনি কি ধরেই নিচ্ছেন আমাদের বাড়িতে মোহরভর্তি চারটি ঘড়া লুকানো আছে?'' খানিক অসহায় উদ্বেগের সুরে প্রশ্নটা রাখলেন সুশোভনবাবু।

খিড়কির দরজা লক্ষ করে পা চালাতে-চালাতে দীপকাকু বললেন, ''কোনও কিছু যেমন ধরে নিচ্ছি না, বাতিলও করছি না কোনও

boiRboi.blogspot.com

সম্ভাবনা। তদন্তের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলাটা এখন ভীষণ জরুরি। ওঁর এলোমেলো কথার মধ্যেও হয়তো পেয়ে যেতে পারি কোনও সূত্র।"

অধ্যাপক প্রবোধ বসুর ঘর দোতলায়। সিঁড়ি ধরে উঠে এসেছে ঝিনুকরা। ওঠার সময় সুশোভনবাবু বলেছেন ওঁর বাবার স্টাডিটা দোতলাতেই। ওই ঘরটাও নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে দেখবেন দীপকাকু।

করিডরে সারি দিয়ে দরজা। একটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুশোভনবাবু। দীপকাকুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "এটাই বাবার ঘর।"

"চলুন, প্রশ্নটা যেভাবে করতে বলেছি, সেভাবেই করবেন," বলে সুশোভনবাবুর পিছু-পিছু ঘরে ঢুকলেন দীপকাকু, সঙ্গে ঝিনুক।

ঘরটা বেশ বড়। ষড়ঘড়ি দেওয়া জানলার পাল্লা খোলা। শীতের রোদ এসেছে পড়েছে পালঙ্কে। সেখানেই বসে আছেন এক বৃদ্ধ। ঘাড় নামানো। মাথাটা অল্প কাঁপছে। পালঙ্কের কাছে গিয়ে সুশোভনবাবু ডাক দিলেন, "বাবা! ও বাবা! দেখো, কলকাতা থেকে আমার এক পরিচিত তোমাকে দেখতে এসেছেন। নামী সাইকোয়াট্রিস্ট।"

দীপকাকু এই পরিচয়টাই দিতে বলেছিলেন দোতলার সিঁড়িতে ওঠার আগে। তার সঙ্গে আরও কিছু ইনস্ট্রাকশন দেন। ছেলের গলা শুনেও মুখ তুললেন না প্রবোধ বসু। কথা কান হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছছে কি না, কে জানে! দেখে তো মনে হচ্ছে স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব খারাপ। খাটের ধার ঘেঁষে বসলেন সুশোভন। বাবার উদ্দেশে বললেন, "তুমি যে চারঘড়া মোহর সাবধানে রাখতে বলছ, সেগুলো তো খুঁজেই পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছ?"

ঠিক এরকম স্বাভাবিক ঢংয়েই প্রশ্নগুলো করতে বলেছেন দীপকাকু। কিন্তু উত্তর এল না। মাথাও উঠল না প্রবোধবাবুর। আগের মতোই অল্প কেঁপে যাচ্ছে। পরবর্তী প্রশ্নে গেলেন সুশোভন। চাপা গলায় জানতে চাইলেন, "ঘড়াগুলো পেয়েছিলে কোথায়?"

এবারও কোনও উত্তর নেই। দীপকাকুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুশোভনবাবু বললেন, "আপনাদের সঙ্গে মিট করার আগে যখন দেখে গেলাম, কন্ডিশন এত খারাপ ছিল না। এ রোগের প্রকোপ কখন বাড়ে কখে কোনও ঠিক নেই।"

হঠাৎ কী যেন বলে উঠলেন প্রবোধবাবু। জড়ানো ভারী গলা। ঝিনুক শুনল, থুপ। কিন্তু শব্দটার তো কোনও মানে হয় না। অথচ দীপকাকু উৎসাহিত হয়ে সুশোভনবাবুকে বললেন, "জিজ্ঞেস করুন ঘড়াগুলো কোথায় রেখেছেন?"

দীপকাকুর নির্দেশ পালন করলেন সুশোভন। প্রবোধবাবুর থেকে উত্তর এল একটু দেরিতে, সেই একই উত্তর, "থুপ।" ডাঃ সুশোভন হতাশ দৃষ্টিতে তাকালেন দীপকাকুর দিকে। কপালে ভাঁজ ফেলে দীপকাকু বলে উঠলেন, "কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। উনি বলতে চাইছেন 'স্তূপ'। যদি ধরে নিই উনি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরে উত্তরটা দিচ্ছেন, তা হলে বলতে হয় চারটে ঘড়া উনি স্তূপ থেকে পেয়েছিলেন আবার স্তূপেই রেখেছেন। তা হলে আপনাকে সাবধান করছেন কেন? কথা মতো চারটে ঘড়া পাওয়া উচিত সনাতন বেরার ভিটেতে।"

"সনাতন বেরার ভিটেতে কোনও স্তূপ নেই। বিষ্ণুকাকা যখন রটালেন ওখানে প্রাচীন মুদ্রা পেয়েছেন বাবা, সনাতন বেরা সহ গ্রামের অন্যান্য লোক জায়গাটা অনেকটা গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে ছিল। ওদের বয়ানে মুদ্রা পাওয়া যায়নি। স্তূপসৌধও নেই। কারণ, সৌধ ধরনের বড় কিছু থাকলে ওরা বাবা, বিষ্ণুকাকাকে জানাত," বললেন ডাক্তারবাবু।

ঝিনুক জানতে চাইল, "বড় বলতে কি সাঁচী, সারনাথের মতো স্তূপের কথা বলছেন?"

ডাক্তারবাবুর বদলে দীপকাকু উত্তর দিতে থাকলেন, "না, এখানে অত বড় স্তূপ থাকার কথা নয়। বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে থাকা স্তূপ বিশাল আকারের হয় না।"

আলো আড়াল করে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল এক যুবক। বলে উঠল, "বাবা, মনোহরপুর থেকে আবার ফোন এসেছে। অবস্থা খারাপ হচ্ছে পেশেন্টের। শ্যামলকাকা তোমাকে জানাতে বলল।"

পুত্রের কথা শুনে নিয়ে ডাক্তারবাবু দীপকাকুকে বললেন, "কলটা সেরেই আসি," তারপর যুবকটির দিকে হাত নির্দেশ করে বললেন, "আমার ছেলে আর্য। আপনারা যদি আরও কিছু দেখতে বা জানতে চান, আর্য আমার হয়ে হেল্প করবে।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। বরফচাপাকেরা আর্য ঝিনুকদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। দীপকাকু আর্যকে বললেন, "আমার পরিচয়, কেন এসেছি, এ সব জান নিশ্চয়ই?"

"জানি," বিনয়ের সঙ্গে জানাল আর্য।

দীপকাকু এবার জানতে চাইলেন, "তোমার কি ধারণা, রোগের কারণে প্রলাপ বকছেন ঠাকুরদা? চারঘড়া মোহরের অস্তিত্ব নেই?"

"আমাদের বাড়িতে হয়তো নেই। এই গ্রামের অন্য কোথাও থাকলেও থাকতে পারে। দাদু আমাকে প্রায়ই বলতেন মোগলমারির মাটির নীচে প্রচুর ধনরত্ন, মুদ্রা চাপা পড়ে আছে। সেগুলো গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং আকবরের আমলের।"

আর্যর কথার উত্তরে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "রত্ন এবং মুদ্রা গ্রামের কোথায় থাকতে পারে, তার অনুসন্ধান নিশ্চয়ই করছিলেন উনি?"

"সে তো করবেনই। ওই সব জিনিসের সার্ভে করাই তো ওঁর কাজ। এখানকার ইতিহাস নিয়ে প্রচুর লেখাপড়া করতেন। মাটির নীচে কোথায় কী-কী পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য ম্যাপ আঁকতেন। তারপর চলে যেতেন সেই সব এলাকায়, খুঁটিয়ে অবজ্ঞার করতেন মাটি। সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলতেন..." থেমে গেল আর্য। কী একটু ভেবে নিয়ে কের বলে ওঠে, "আমার কেন জানি মনে হয় রিসেন্ট পাস্টে কোথাও নিশ্চয়ই চারঘড়া মোহরের সন্ধান পেয়েছিলেন দাদু। তারপরই ডিমেনশিয়া হয়ে যেতে চারঘড়া মোহর কথাটা মাথায় থাকলেও, বাকিটা হারিয়ে গিয়েছে।"

ঝিনুককে চমকে দিয়ে বিছানায় বসে থাকা প্রবোধ বসু আবারও জড়ানো ভারী কণ্ঠে বলে উঠলেন, "থুপ, থুপ?" এবারটা একটু জোরে। আর্য বলল, "দেখলেন, আমার কথা সাপোর্ট করলেন দাদু। বলতে চাইলেন ঠিক-ঠিক।"

তা হলে কি দীপকাকুর অনুমান ভুল? 'থুপ' আসলে স্তূপ নয়? দীপকাকু এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করলেন না। আর্যকে বললেন, "তোমার দাদুর স্টাডিটা একবার দেখব।"

"অবশ্যই," বলে দরজার দিকে এগোয় আর্য।

॥ ২ ॥

পরের দিন সকাল। দাঁতনের সেচবাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছে ঝিনুক। বাংলো বলতে বিশাল কিছু নয়। একতলা। 'এল' প্যাটার্নের চারটে ঘর। সামনে ছোটখাট বাগান। বাংলোয় এখন দু'জন মানুষ। ঝিনুক আর কেয়ারটেকার কার্তিক জানা। তবে বেশ কিছুক্ষণ হল কার্তিক জানাকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কোনও সাড়াশব্দও নেই। ঝিনুক হয়তো একাই এখন বাংলাতে। সম্পূর্ণ কাজহীন অবস্থায় বসে আছে। এর জন্য দায়ী সে নিজেই। ঘণ্টাখানেক আগে দীপকাকু ঝিনুকের ঘরের দরজায় নক করেছিলেন। বলেছিলেন, "উঠে পড়ো। রেডি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। বেরব।"

"আচ্ছা। আসছি," বলেছিল ঝিনুক। কিন্তু বিছানা থেকে আর ওঠা হয়নি। পুরোপুরি ঘুম ভাঙতেই সে টের পেয়েছিল দীপকাকু অনেকক্ষণ হল ডেকেছেন। বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে দরজা খুলে বারান্দায় এসেছিল ঝিনুক। কোথাও দীপকাকু নেই। দীপকাকুর রুমটাও তালা মারা। একাই বেরিয়ে গিয়েছেন। ডেকে দেওয়ার পরও ঝিনুক না ওঠার কারণে ভীষণ রেগে আছেন নিশ্চয়ই। কেয়ারটেকার

এসে জানতে চেয়েছিল, "চা, না কফি?"

"কফি," বলেন পর ঝিনুক জিজ্ঞেস করেছিল, "উনি কতক্ষণ হল বেরিয়েছেন?"

কার্তিক জানা বলল, "তা প্রায় আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে। বারান্দায় বসে চা খেয়ে বললেন, 'আমি বেরছি। দিদিমণি ঘুম থেকে উঠলে চা-কফি যা লাগবে দিয়ো। আমার যদি ফিরতে দেরি হয় সময় মতো ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিয়ো ওকে।' "

খানিক আগে কফি-বিস্কুট খেয়েছে ঝিনুক। ব্রেকফাস্টের সময় হয়নি। দীপকাকুর এহেন আচরণে জন্য মেজাজটা বেজায় খিঁচড়ে আছে। ভীষণ অভিমান হচ্ছে ওঁর উপর। যখন উঠছে না দেখলেন, কেন ঝিনুককে দু'বার ডাকলেন না? গতকাল যা পরিশ্রম গিয়েছে, গাঢ় ঘুম হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সবাই তো আর তাঁর মতো নয়। কী অসম্ভব এনার্জি!

কাল সেই কোন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ঝিনুক! তারপর থেকে টানা দীপকাকুর সঙ্গে ঘুরপাক খেয়েছে। কলকাতা থেকে দাঁতনে এসে দুপুর পর্যন্ত কাটল ডাঃ সুশোভন বসুর বাড়িতে। ডাক্তারবাবু কলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর্যর সঙ্গে যাওয়া হল প্রবোধ বসুর স্টাডিতে। ঘরের তিনটে দেওয়াল জুড়ে আলমারি, কাঠের ফ্রেমের কাচের স্লাইডিং পাল্লা। আলমারি নীচের অংশ কাঠের ক্যাবিনেট। প্রত্যেকটা পাল্লার ফ্রেমে তালা মারা। যা থেকে আন্দাজ করা যায় ক্যাবিনেটগুলোও লকড অবস্থায় আছে। দীপকাকু আর্যকে বলেছিলেন, "কিছু তালা দেখছি পুরনো, কিছু নতুন। এটা কেন?"

"পুরনোগুলো দাদুর লাগানো। ওখানে নাকি ইম্পর্ট্যান্ট বই, ফাইলটাইল আছে। দাদুর রোগটা যখন বাড়ল, একা এঘরে আসার মতো অবস্থা ছিল না। বাবা সব জায়গাতেই তালা মেরে দিলেন। ওগুলোই নতুন," বলেছিল আর্য।

দীপকাকু ততক্ষণে প্রবোধ বসুর চেয়ার-টেবিলের পাশে বইপত্রহীন আলমারিটার সামনে চলে গিয়েছেন। সেটার র‍্যাকে শুধু টুকরোটাকরা প্রত্নবস্তু। সবই প্রায় মাটির। ভিনিসগুলো অতি যত্ন সহকারে সাজানো। প্রতিটার নীচেই সাদা কাগজের উপর লেখা পরিচয়লিপি। সেই আলমারির তালা পুরনো। সব ক'টা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরটা জরিপ করে নিয়ে দীপকাকু আর্যকে বলেছিলেন, "দাদুর চৌচামেচিতে তুমিই তো এসে দেখেছিলে এখানকার মেঝেতে বইপত্র ছড়ানো?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল আর্য। তারপর বলেছিল, "শুধু বই নয়। দুটো ফাইলও ছড়ানো ছিল।"

"যে সব জিনিস মাটিতে ফেলা হয়েছিল। দেখাতে পারবে?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

আর্য বলল, "না। আমার স্পষ্ট করে মনে নেই। বাবা জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলে রেখেছিলেন আলমারিতে।"

"ঠিক আছে, আপাতত যে-কোনও বই এবং ফাইল দিয়ে ঘরটা সেদিন যেরকম অবস্থায় ছিল, সেভাবে সাজিয়ে দেখাও তো। সেই স্মৃতি নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি?" বলেছিলেন দীপকাকু।

আর্য বলল, "তা ভুলিনি। দেখাচ্ছি সাজিয়ে। আগে চাবি নিয়ে আসি আলমারির।"

আর্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই দীপকাকু আলমারিগুলোর পিছন দিকটা দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। কেন চেষ্টা করছেন বোঝেনি ঝিনুক। দেখার আছেই বা কী? কাঠের আলমারিগুলো দেওয়ালে প্রায় সাঁটানো। প্রশ্নটা এখনও পর্যন্ত করা হয়নি দীপকাকুকে। নোটবুকে লিখে রেখেছে ঝিনুক।

আর্য চাবি নিয়ে এসে একটা আলমারি খুলছিল। দীপকাকু বললেন, "এই আলমারিটার বই-ফাইল ফেলা হয়েছে। এটা অন্তত তোমার মনে আছে বোঝা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, সেটা মনে আছে," বলেছিল আর্য।

তখন দীপকাকু বলেছিলেন, "এই আলমারির তালা পুরনো। অর্থাৎ মূল্যবান নথিপত্র আছে। প্রবোধবাবু তালা মেরে রাখতেন। চাবি কোথায় থাকত এবং সেটা এবারিও কে-কে জানে?"

"বাবা জানতেন একমাত্র। এখন আমায় জানিয়ে রেখেছেন। আর বোধ হয় জানেন মা।"

আর্যর কথার পিঠে দীপকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আলমারির চাবি কোথায় রাখতেন প্রবোধবাবু?"

"দাদুর ঘরে একটা স্টিলের আলমারি আছে, তার হিডন চেস্টে। বাবা বলার আগে আমি জানতামই না ওখানে ওরকম একটা লুকনো তাক আছে," কথা বলতে-বলতে আলমারি খুলে আর্য খোঁজার চেষ্টা করছিল সেই সব বই-ফাইল, যেগুলো ছড়ানো ছিল মাটিতে।

বেশ কিছু বই এবং দুটো ফাইল হাতে নিয়ে আর্য-দীপকাকুকে বলল, "মনে তো হচ্ছে এগুলোই পড়েছিল ফ্লোরে। তবে আমি হান্ডেড পার্সেন্ট শিওর নই।"

"ঠিক আছে। এবার এগুলো সাজিয়ে দাও মেঝেতে।"

দীপকাকুর নির্দেশ মনে করে-করে আর্য বই, ফাইল ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘটনার দিনের মতো। অনেকগুলো সাজানোর দিকে তাকিয়ে রইলেন দীপকাকু। এক সময় মুখ তুলে আর্যর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "তুমি ঘরে ঢুকে প্রবোধবাবুকে ঘরের কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল?"

"ওই আলমারিটার সামনে," যে আলমারির থেকে বই-ফাইল বের করেছিল আর্য, সেটাই দেখাল। দীপকাকু স্বগতোক্তিও ঢরয়ে বললেন, "তার মানে মনোবিকারের কারণে নিজেও বইগুলো ছুড়ে ফেলতে পারেন। আবার উলটোও হতে পারে।"

"উলটো বলতে?" সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

দীপকাকুর উত্তর ছিল, "যে ব্যক্তি এ ঘরে ঢুকেছিল, প্রবোধবাবুর মানসিক অবস্থার ব্যাপারে সে ওয়াকিবাল। সেদিন একটু বেশিই সাহস নিয়ে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। প্রবোধবাবু যে হঠাৎ ঘরে ঢুকে আসবেন, ভাবতে পারেনি। হাতের জিনিস ফেলে পালিয়েছে।"

দীপকাকুর কথার প্রেক্ষিতে আর্য বলেছিল, "আপনার একটা পয়েন্ট ভ্যালিড। শরীর এবং মেন্টাল কন্ডিশনের জন্য দাদু তখন স্টাডিতে আসা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ কী মনে হতে চলে এসেছিলেন সেদিন। কিন্তু কে বাইরে থেকে এসে দোতলার এই স্টাডিতে ঢুকবে বলুন তো? তাও আবার দিনের আলোতে। বাড়ির লোকেদের চোখে পড়বে না?" একটু থেমে ফের আর্যই বলল, "তা ছাড়া দাদু চেঁচামেচি জুড়তেই আমি মিনিটখানেকের মধ্যে এঘরে ঢুকি। লোকটা যদি ওই সময়ের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়েও যায়, বাড়ি থেকে তো বেরতে পারবে না। কারও না-কারও চোখে পড়বেই।"

"তা হলে হয়তো এবাড়িরই কোনও সদস্য," নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছিলেন দীপকাকু।

আর্য থতমত খেয়ে বলে উঠেছিল, "বাড়ির লোক?"

মাথা উপর-নীচ করে দীপকাকু বলেছিলেন, "তেমনটা হওয়ারই তো চান্স বেশি।"

অবাক ভাব কাটছিল না আর্যর। তার মাঝেই দীপকাকু হাঁটু মুড়ে বসে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা বই-ফাইলগুলো উলটে পালটে দেখা শুরু করেছিলেন। যদিও ঘটনার দিন এই বইখাতাগুলো ফেলা হয়েছিল কিনা, এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি আর্য। জিনিসগুলো দেখতে দেখতেই দীপকাকু আর্যর উদ্দেশে বলেছিলেন, "তোমার কাকা তো মুম্বইয়ে থাকেন। ঘটনার দিন বাই এনি চান্স ছিলেন এবাড়িতে? মানে ছুটিছাটায় এসেছিলেন কি?"

"না, আসেননি," বলেছিল আর্য।

কোলে একটা ফাইল নিয়ে মেঝেতে পুরোপুরি বসে পড়েছিলেন দীপকাকু। ফাইলে চোখ রেখে আর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বাড়িতে কে-কে থাকে?"

"বাবা-মা। কাকিমা-কাকার এক ছেলে, এক মেয়ে। কাকিমার ভাই বলাইমামা। কাজের লোক রবিদা আর অনন্তদা," বলেছিল আর্য।

ঝিনুকের মনে হয়েছিল কয়েকজন বোধ হয় বাদ গেল। তাই খেয়াল করিয়েছিল, "নীচের তলায় একটা বাচ্চা ছেলে আর দু'জন মহিলাকে দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা, আনাজ কাটছিলেন দালানে। ইয়ার যিনি, কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন উঠোনের তারে। আরও দু'জনকেও দেখেছি, সম্ভ্রান্ত চেহারা। তাঁরা সম্ভবত আপনার মা-কাকিমা।"

"হ্যাঁ, বাকি দু'জন কাজের লোক। বুড়ি মহিলা গঙ্গার মা, আর পূর্ণিমা মাসি। বাচ্চা ছেলেটা পূর্ণিমামাসির ছেলে সম্ভু। ওরা সকাল-সকাল চলে আসে। সন্ধে নামার আগে বাড়ি ফিরে যায়," বলেছিল আর্য।

দীপকাকু মেঝেয় ছড়ানো বই-ফাইল এক জায়গায় এনে প্রবোধ বসুর টেবিলে রেখে আর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাকিমার ভাই, মানে বলাইমামা কাজকর্ম কী করেন?"

"সে রকম কিছু না। এ বাড়ির বাজার-সরকার বলতে পারেন, আর দাদুর হেল্পিং হ্যান্ড। এখন তো আর দাদুর কাছে হেল্প করার কিছু নেই। মামার অনেকটা সময়ই এখন ফাঁকা। মনটাও খারাপ। দাদুর কাজগুলো করতে খুব আগ্রহ পেতেন। এখন বলছেন ফিরে যাবেন নিজের বাড়ি।"

আর্যর বলা শেষ হতে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁর বাড়ি কোথায়?"

আর্যর উত্তর থেকে জানা গেল কাঁথি শহরে। দীপকাকু ফের এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রত্নবস্তুর আলমারির সামনে। ওখান থেকে আর্যকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা ভাইবোনেরা কে কী করো?"

আর্য বলেছিল, "আমি কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করে চাকরির অ্যাপ্লাই করছি। আমার খুড়তুতো ভাই গ্র্যাজুয়েশন করেছে। গানবাজনা নিয়ে থাকে। শো করে রোজগারও করছে। খুড়তুতো বোন বি এস সি পড়ছে।"

আলমারির সামনে থেকে সরে এসে দীপকাকু শূন্যে দৃষ্টি ভাসিয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, "যদি বাড়ি বা বাইরের কেউ আলমারিটা খুলে থাকে, তা হলে চাবি পেল কোথায়? তখনও পর্যন্ত চাবির ঠিকানা জানতেন প্রবোধবাবু এবং ডাক্তারবাবু। এই দু'জন ছাড়া আলমারি যদি কেউ খুলে থাকে, চাবির ছাপ নিয়ে নকল করাতে হয়েছে। যেখানে চাবি রাখা থাকত, সেখান থেকে নিয়ে আলমারি খুলে জায়গামতো ফেরত রাখা বেশ ঝামেলার ব্যাপার।"

আর্য বলে উঠেছিল, "তার মানে দাদু মনের ভুলে কাউকে এ ঘরে দেখেছেন, এটা আপনি পুরোপুরি মেনে নিচ্ছেন না। সত্যিই কেউ বিশেষ উদ্দেশ্যে লুকিয়ে ঢুকতে পারে স্টাডিতে?"

"ঠিক তাই। আর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রবোধবাবুর রিসার্চওয়ার্ক থেকে প্রত্নবস্তুর সন্ধান অথবা রিসার্চওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ চুরি। কারণ তোমার থেকেই জেনেছি মাটির নীচে কোথায় কী-কী পাওয়া যেতে পারে, সেটা নির্দিষ্ট করাও ছিল প্রবোধবাবুর অন্যতম কাজ," বলেছিলেন দীপকাকু।

boiRboishala.blogspot.com

আর্য জানতে চায়, "এই কাজটা দাদু অনেক বছর ধরে করছেন, আগে তো কেউ রিসার্চওয়ার্ক হাতাতে আসেনি। দাদু অসুস্থ হওয়ার পরই তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন কেন? এক্ষেত্রে মনের ভুলটাকেই স্বাভাবিক কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।"

"আমি বলব উলটো কথা, প্রবোধবাবুর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সে ঢুকেছে স্টাডিতে। আগের মতো আর সজাগ নন, স্টাডিতে অনিয়মিত আসেন। সেই ফাঁকে দুষ্টুটা নিজের কাজ সারার চেষ্টা করছিল। সে এটাও জানত, প্রবোধবাবু যদি কারও অস্তিত্ব টেরও পান এবং সে কথা বাড়ির লোককে বলেন, সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। সকলে তাঁর অসুস্থতাকেই দায়ী করবে," বলেছিলেন দীপকাকু।

আর্যর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যুক্তিটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না। বলেছিল, "একটা লোক স্টাডিতে ঢুকছে, বেরচ্ছে, সে যদি বাড়ির একজনও হয়, কেউ টের পাবে না! লোকটা কোন কায়দায় ব্যাপারটা করছে?"

"কায়দা তো একটা আছেই। আমি যেন সেটা দেখতেও পাচ্ছি," এটুকুই বলেছিলেন দীপকাকু। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। আর্যকে বলেন, "বৌদ্ধবিহারটা যেখানে আবিষ্কার হয়েছে, এবার সেখানে যাব। তুমি আমাদের দেখিয়ে দিয়ে দেবে। জায়গাটা।"

আর্য বলেছিল, "আমি তো থাকবই, সঙ্গে বলাইমামাকে ডেকে নিচ্ছি। মামা বৌদ্ধবিহারটার সম্বন্ধে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। দাদুর সঙ্গে ঘুরতেন তো সব সময়।"

আর্যর বলাইমামার পুরো নাম বলাইচাঁদ শিট। তাঁকে নিয়েই ঝিনুকরা পৌঁছেছিল লোহার তার দিয়ে ঘেরা মোগলমারির বৌদ্ধবিহারে। জায়গাটা এখনও বেশ উঁচু এবং এরিয়াটা প্রমাণ সাইজ ফুটবল মাঠের মতো। টিবিতে ওঠার আগে ছোট একটা গেট আছে, তারপর সিঁড়ি। বছরপঁয়তাল্লিশের বলাইবাবু সিঁড়ির ধাপে পা দেওয়ার আগে একবার হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিয়েছিলেন। আর্য কিন্তু করেনি। বোঝা গিয়েছিল ওই বৌদ্ধবিহারে পূজা-প্রার্থনা নাই হলেও, বলাইবাবু স্থানটিকে মন্দিরের মর্যাদা দেন।

টিবিতে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত ঝিনুকের ধারণা ছিল নালন্দার মতো না হলেও, অনেকটাই উন্মুক্ত বৌদ্ধবিহার দেখবে। সেরকমটা দেখা গেল না। টিবির কিছু-কিছু জায়গা খোঁড়া অবস্থায় পড়েছে, বলাইবাবু বলেছেন। আরও গভীর পর্যন্ত উৎখনন হয়েছিল। খোলা অংশ মাটি চাপা দিয়ে স্থাপত্যগুলোকে অক্ষত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরাকীর্তি হাজার-হাজার বছর ধরে মাটির তলায় অবিকৃত থাকে। খোলা অবস্থায় রাখলেই জল-হাওয়া-রোদের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়। নষ্ট হতে থাকে পুরাবস্তুগুলো। ক্ষয়রোধের জন্য নানান ব্যবস্থা নিতে হয়। সে বিরাট এক খরচার ব্যাপার। টিবির খানিকটা অংশে ওই ব্যবস্থা নিয়েছে স্টেট আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া সেই জায়গায় সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়েছিল। সেখানে বিহারের দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন মূর্তি, পদ্মফুল, ধর্মচক্র দেখে ঝিনুক রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল। হাজার, দেড় হাজার বছর আগের শিল্পকীর্তি তখন তার সামনে। শিল্পী নিজেও কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন ২০১৮ সালে কেউ তাঁর শিল্প দেখবে?

বলাইবাবুর কাছ থেকে জানা গেল দেওয়ালের ওই স্থাপত্যকে বলা হয় স্টাকোর অলংকরণ। স্টাকো হচ্ছে চুন, মার্বেল, পাথরের গুঁড়ো, শঙ্খচূর্ণ, আঠা ইত্যাদি মেশানো কাদা ধরনের বস্তু, যা দিয়ে মূর্তি বা অলংকরণের কাজ হয়েছে। এই ধারাটি মধ্যপ্রাচ্য হয়ে এদেশে এসেছে প্রায় দু'হাজার বছর আগে। আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন, বৌদ্ধবিহারটি নাকি তিনবার নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

বৌদ্ধবিহারটা যে বলাইবাবু নিজের হাতের তালু মতো চেনেন, বোঝা যাচ্ছিল তাঁর বর্ণনা থেকে। মাটি বা অল্প উন্মুক্ত স্থাপত্যের দিকে আঙুল নির্দেশ করে এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন, পুরো বিহারটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ঝিনুকের। দেখালেন বৌদ্ধবিহারের প্রবেশদ্বারটা কোথায় ছিল। স্তূপ ঘিরে শ্রমণ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনিক পথ। সারি দেওয়া তাদের আবাসকক্ষ... টিবির মাথায় স্থানীয় একটি ক্লাবের পাকা ঘর আছে। ক্লাব সদস্যরাই অনেক বছর ধরে নিজেদের উদ্যোগে দেখাশোনা করছে প্রত্নক্ষেত্রটির। ঝিনুকরা যখন ঘুরে-ঘুরে সব দেখছে, একজন ক্লাব সদস্যও ছিলেন সঙ্গে, নাম জয়দেব পণ্ডা। তিনিও কিছু তথ্য সরবরাহ করছিলেন। নিয়ে গেলেন ক্লাবঘরের মধ্যে। একটি ঘরে সাময়িক বইপত্র এবং বিহারের প্রাচীন বস্তুর প্রদর্শনী। সেখানে দেখা গেল লিপি উৎকীর্ণ কয়েকটি সিল। মাটির ভাঙা প্রদীপ, অর্ধাপাত্র, কিছু কড়ি, মাটির উৎসর্গপত্র, কিছু পেরেক। কাঠের ছাউনির তক্তা জোড়ার কাজে ওই পেরেকগুলো ব্যবহার হয়েছিল। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছিলেন দীপকাকু। ঝিনুক ফাঁকি মারছিল। কাঁহাতক আর পোড়ামাটির টুকরোটাকরা দেখা যায়। দীপকাকুর মতো ধৈর্য তার নেই। জয়দেব পণ্ডার উদ্দেশে দীপকাকু বলেছিলেন, "এখানে টুরিস্ট কেমন আসে? আপনারাই নিশ্চয়ই গাইড করেন?"

"টুরিস্ট খুব বেশি আসে না। এসে দেখবেটা কী! বেশির ভাগটাই তো মাটি চাপা দেওয়া। মাঝে-মাঝে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসে, টিচাররাও আসেন। যতদূর জানি ওদের গাইড করি," বলে জয়দেব পণ্ডা সেই গেমেছেন, আর্য বলে উঠেছিল, "আর যারা স্পেশাল কাজে আসে তাদের কথা বলো!"

মুচকি হেসে নিয়ে জয়দেব পণ্ডা বলতে থাকলেন, "আসলে কিছু চোরাছাঁচড়ও টুরিস্ট সেজে ঢুকে পড়ে এখানে। তাদের উপর নজর রাখতে হয়। টিবির আনাচে-কানাচে মাটির সঙ্গে মিশে আছে অনেক মূল্যবান পুরাবস্তুর অংশ বিশেষ। আমাদের চোখে যেতে হয়েছে পড়েনি। ওদের চোখে ঠিক পড়ে যায়। এই বিষয়ে ওরা এক্সপার্ট। যেমন গুপ্তযুগের পোড়া মাটির কালো পাত্রের টুকরো, আলাদা করে চোখে পড়ে না। ওরা চট করে মাটি থেকে তুলে ব্যাগে পুরে নেবে।"

"তারপর কী করবে?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

জয়দেব বললেন, "প্রত্নসামগ্রীর চোরাবাজারে বিক্রি করে দেবে। সেটা আন্তর্জাতিক বাজার। এইটুকু মাটির টুকরোই অনেক দাম! বাইরের লোক হামেশাই আমাদের গ্রামে ঘোরাফেরা করে। কোনও গৃহস্থের কাছে যদি পুরনো জিনিসপত্র কিছু থাকে, অল্প টাকায় কিনে নেবে তারা। পুরাবস্তুর আকর তো এই টিবি, তাই এখানেই ওদের নজর বেশি। হয়তো দিনের বেলা টুরিস্ট সেজে দেখে গেল কিছু, রাতে এসে হানা দেয়। তাই রাত জেগে এই টিবি পাহারাও দিই আমরা।"

"শুধু পাহারায় কাজ হয় না। বুদ্ধিকেও সজাগ রাখতে হয়," বলেছিলেন বলাইবাবু। এর পর পণ্ডার উদ্দেশে বলেন, "মেটালের খোঁজে আসা চিটিংবাজটার কথা বলো জয়দেব।"

"হ্যাঁ," বলে পণ্ডা শুরু করেন, "একবার জানেন, লোহার একটা ভাঙা পাত্র পাওয়া গিয়েছিল টিবিতে। লোহার জিনিস এখানে খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। আমরা ভাবছি এটা কোন যুগের? কত পুরনো? তামা, ব্রোঞ্জ, মিশ্র ধাতুর টুকটাক জিনিস হামেশাই পাওয়া যায়। লোহার পাত্রের টুকরো পেয়েছিল আমাদের ক্লাবেরই এক মেম্বার। খবর দিয়েছিলাম স্টেট আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টে। টুকরোটা রাখা হয়েছিল ক্লাবঘরের মিউজিয়ামে। হঠাৎ একটি ভদ্রসভ্য চেহারার ছেলে এসে উপস্থিত। বলল, স্টেট আর্কিয়োলজি থেকে এসেছে। ওই টুকরোটার সামান্য স্পেসিমেন চাই। পরীক্ষা করে দেখা হবে পাত্রটা কোন সময়ের। গোটা টুকরোটাই যখন চায়নি, আমি দিয়ে দিতেই পারতাম। কী মনে হল, আড়ালে গিয়ে অমিয়স্যারকে ফোন করে ছেলেটার কথা বললাম। অমিয় সেনগুপ্ত স্টেট আর্কিয়োলজির একজন আধিকারিক। উনি টিম হেড হয়ে এখানে উৎখননের দেখাশোনা করছেন। আমার ফোন পেয়ে বললেন, 'তুমি এক্ষুনি ছেলেটাকে ওখান থেকে ভাগাও। ডিপার্টমেন্ট থেকে কাউকেই আমরা পাঠাইনি। মনে হচ্ছে ছেলেটা আর্টিফ্যাক্টের দালাল। স্পেসিমেন থেকে জেনে

নেবে জিনিসটা কত দামি, তখন আর টুকরোটার হাতানোর কথা ভাববে না। নিজেই লুকিয়ে ঘোঁড়াখুঁড়ি চালাবে ওই মউন্ড বা তার চারপাশে। যদি ওরকম বড়সড় কোনও লোহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অমিয়সাগরের সঙ্গে কথা শেষ করে যখন ফিরলাম বারান্দায়, চেয়ারে চেয়ারে নেই। আশপাশে কোথাও দেখা গেল না। পুরো হাওয়া। ওকে পরেও দু'বার আমি দেখেছি গ্রামের রাস্তায়। পাশে আরও কয়েকটা অচেনা মুখ থাকে। আমাকে দেখলেই ছেলেটা রাস্তা বদলে অন্যদিকে চলে যায়।"

জয়দেব পণ্ডার কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন দীপকাকু। কী একটু ভেবে নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের এখানে মূল্যবান এবং একই সঙ্গে আর্থিকভাবে দামি কী-কী জিনিস পাওয়া গিয়েছে?"

উত্তর দেওয়ার ভার নিলেন বলাইবাবু। বলেছিলেন, "মাটির জিনিসগুলো টাকার দিক থেকে ততটা দামি না হলেও, যাছেই মূল্যবান। বাকি যা পাওয়া গিয়েছে, চোরাবাজারে তার বিরাট ডিমান্ড। যেমন, জীবজন্তুর দাঁত, লৌহমল, পাথরের মূর্তি, খেলনা গুটি, প্রচুর কড়ি, শিলনোড়া, শাঁখের টুকরো, খেলনা গাড়ির চাকা, ওজন মাপার বাটখারা, চুড়ি, তামার আংটি, হাতির দাঁতের পুঁতি পাওয়া গিয়েছে বেশ ভাল সংখ্যায়, পুঁতিগুলো বিভিন্ন মানের ও আয়তনের। বেশির ভাগই গলার হার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। এছাড়া রোঞ্জের উপর সোনার প্রলেপ দেওয়া মুকুট, সোনার একটি লকেট, মিশ্রধাতুর একটি মুদ্রা।"

"একটি মুদ্রা?" হতাশ গলায় বলে উঠেছিল বিনুক। কারণ, যেখানে চারঘড়া মোহরের সন্ধানে নামা হয়েছে, সেখানে আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে একটি মুদ্রা, তাও আবার মিশ্র ধাতুর। দীপকাকুর তদন্তে নামাটাই বৃথা যাবে মনে হচ্ছে।

বিনুককে দমে যেতে দেখে জয়দেব পণ্ডা বলে উঠেছিলেন, "এখনও অবধি যা শুনলে এটা লোকগোচরে এসেছে। বহু বছর ধরেই বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছে এখানে। সে সব গোপনে হাতবদল হয়েছে, লুকিয়েও রেখেছে অনেকে। ১৮৭৩ সালের হ্যারিসনসাহেবের আর্কিয়োলজির রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে রাজঘাট রোড বানানোর জন্য মোগলমারি ও সাত দেউলা থেকে ২৬ লক্ষ ইট ও পাথর তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রত্নক্ষেত্রগুলোর ব্যাপারে এতটাই কেয়ারলেস ছিল তখনকার মানুষ। ইট-পাথর তুলে নেওয়ার সময় নিশ্চয়ই প্রচুর প্রত্ননিদর্শন প্রকাশ্যে এসেছিল, সেগুলো আজ কোথায়, কেউ জানে না।"

কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিল আর্য। পণ্ডা কথা শেষ করতেই সে বলে উঠল, "সবচেয়ে এক্সাইটিং আবিষ্কারের কথা তো বলাই হল না এখনও।"

দীপকাকু আর্যর মুখের দিকে ঘাড় ফেরান। আর্য ঢিবিসংলগ্ন মাঠের দিকে আঙুল তুলে বলে, "গত বছর জানুয়ারি মাসে ওখানে বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল হচ্ছিল। শুরুর দিন সকালে উদ্বোধনী মন্ত্র মাইকে ভেসে আসছে... বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আর এখানে একটা ট্রেঞ্চ থেকে ওঠানো হচ্ছে একটার পর-একটা মূর্তি। বিকেল পর্যন্ত পঁচানব্বইটা। সবগুলো রোঞ্জ বা মিশ্র ধাতুর তৈরি বুদ্ধ, বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এবং ছোট-ছোট ভোটিভ স্তূপ। লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল আমাদের এই ঢিবি।"

"এক জায়গায় এত মূর্তি থাকার কারণ?" প্রশ্নটা বলাইবাবুকে করেছিলেন দীপকাকু। যেহেতু উনিই এই প্রত্নক্ষেত্রটি বিষয়ে বাকি দু'জনের চেয়ে বেশি জানেন। উত্তরে বলাইবাবু বললেন, "পরিখার উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখা ছিল মূর্তিগুলো। যত দূর অনুমান করা যায়, শত্রুদের লুণ্ঠনের আশঙ্কায় মূর্তিগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন মহাবিহারের আবাসিকরা।"

তথ্যটা জানার পর নতুনভাবে উৎসাহ পায় বিনুক, অত দামি জিনিস যদি এখানে লুকনো থাকে, তা হলে চারঘড়া মোহরের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দীপকাকু বলাইবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওই সব দামি মূর্তি এখানে কোথা থেকে এসেছিল? শ্রমণ-ভিক্ষু, সন্ন্যাসীরা তো বিহারে বসে এসব বানাবে না।"

বলাইবাবু বললেন, "একসময় এই প্রত্নক্ষেত্রের পিছন দিয়ে বয়ে যেত সুবর্ণরেখা নদী। এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সুবর্ণরেখা তখন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। বণিকরা এই পথ ধরেই দক্ষিণ ভারতে ব্যবসা করতে যেত। বিহাম এবং পুণ্য অর্জনের জন্য নদীর ধারে এই মহাবিহারে কাটাত কয়েকটা দিন। সম্ভবত ওরাই এই মূর্তিগুলো উৎসর্গ করেছে এখানে।"

একথা শোনার পর বিনুকের আবার মনে হতে থাকে, চারঘড়া মোহর মোটেই অলীক নয়। মূর্তিগুলোর মতোই হয়তো লুকনো ছিল সনাতন বেরার জমির নীচে। বৌদ্ধবিহার এই ঢিবিতে আবিষ্কার হয়েছে মানে তার আশপাশের জমিও প্রত্নক্ষেত্র হিসেবে বেশিই সম্ভাবনাময়।

ক্লাবঘরের মিউজিয়াম দেখার পর বলাইবাবু বলেছিলেন, "চলুন, সুবর্ণরেখা কোন দিকে বয়ে চলেছে দেখাই।"

বাইরে তখন বেশ রোদ। ঢিবির উপর বেশ কিছু প্রাচীন বৃক্ষ, যার একটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল বিনুককরা। এদিকওদিক পাখি ডাকছিল সুর করে। বলাইবাবু দূর নির্দেশ করে আঙুল তুললেন। বলেছিলেন, "ওইখানে সুবর্ণরেখা। তবে খালি চোখে দেখতে পাবেন না। বাইনোকুলার লাগবে।"

সত্যিই দেখা যাচ্ছিল না। ফাঁকা বিস্তীর্ণ ঢালু জমি। আরও দূরে আবছায়ায় পাহাড়ভুজেণী। বলাইবাবু বলে যাচ্ছিলেন, "নদী যে বিহারদের গা দিয়ে বয়ে যেত এর বিশাল চওড়া ও গভীর ছিল, তার প্রমাণ আছে ভূমিস্তরে। বিশাল নোঙর, জাহাজ। নৌকোর বিভিন্ন অংশ পাওয়া গিয়েছে মাটির নীচে।"

থেমে গিয়ে ফের বলাইবাবু বলতে শুরু করেছিলে। কণ্ঠস্বর তখন বেশ ভাবগম্ভীর। বলছিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে কল্পনা করুন, রাত শেষ। তখনও সূর্যদেব সপ্তাশ্ববাহিত রথ চেপে অন্ধকারের দরজা ভেদ করেননি। বিহারের আশপাশের দিঘিতে প্রভাত বাতাসের মৃদু বয়ে চলা। ধরিত্রী যেন তখনও ধ্যানমগ্না। বিহারের বাইরের স্তূপগুলোতে গত রাতে জ্বালা প্রদীপ তেল নিঃশেষ করে নিভে গিয়েছে। চীবরপরিহিত শ্রমণেরা ঘুমলাগা চোখে প্রদক্ষিণ করছে বিহারের স্তূপ ঘেরা পথ। কখন যেন সূর্যের প্রথম কিরণ ছুঁয়ে ফেলল বিহারের পূর্ব দেওয়াল। লাল-হলুদ আলোয় স্পষ্ট হতে থাকল দেওয়ালের অলংকরণ, শৈল্পিক কাজ। কুলঙ্গির সারি-সারি মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। মূলমন্দিরে উচ্চারিত হত থাকল প্রার্থনামন্ত্র। শুরু হয়ে গেল বিহারের দৈনন্দিন জীবনচর্চা পূজা ও বিদ্যাশিক্ষা।

"সন্ধেয় সুবর্ণরেখার বুকে ফুটে উঠত বিহারের আলোকোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। বিহারের সমস্ত কক্ষে, স্তূপে জ্বলত মাটির প্রদীপ। সেই আলো যেন জ্ঞানের, শান্তির। দূরদেশের শ্রান্ত নাবিকরা ভগবানের সান্নিধ্য পেতে জাহাজের মুখ ঘোরাত মহাবিহারের দিকে। আজ সেই বিহার হাজার-হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। মানুষের অজ্ঞানতায়, উপেক্ষায় তার প্রবল ক্ষয় হয়েছে। মানুষের লোভ লুণ্ঠন করেছে তার সম্পদ, ওছাড়াও তাকে বারবার ধ্বংস করতে চেয়েছে ধর্মান্ধতা।"

কথাগুলো শুনতে-শুনতে গা কাঁটা দিচ্ছিল বিনুককের। ডাঃ সুশোভন বসু কখন যেন নিঃশুপে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিনুককদের পাশে। বলাইবাবু বর্ণনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাননি। উনি থামার পর ডাক্তারবাবু দীপকাকুকে বলেছিলেন, "বেশ বেলা হল। চলুন, আমাদের বাড়িতে লাঞ্চটা সেরে নিন। তারপর বিশ্রাম নেবেন। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি সেচবাংলোতে। এখান থেকেই কাছেই।"

গাছতলা থেকে সরে এসে দীপকাকু বললেন, "ঠিক আছে, আগে খেয়ে নেওয়া যাক। খিদেও পেয়েছে। আপনি এর মধ্যে কিছু মাইতির সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করুন। ওঁর থেকে কিছু জিনিস জানার

boiRboi.blogspot.com

আছে।"

"আপনি যেহেতু আমার লোক, বিষ্ণুকাকা বলা বলতে রাজি হবেন না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর থেকে আমাদের গোটা পরিবার ওঁর কাছে শত্রুপক্ষ," বলেছিলেন সুশোভনবাবু।

ঢিবির সিঁড়ি ধরে নামতে-নামতে দীপকাকু কপালে ভাঁজ ফেলে বলেছিলেন, "ওঁর সঙ্গে কথা বলাটা ভীষণ জরুরি। বিষ্ণুবাবু যেহেতু ক্লেম করছেন উনি নিজের চোখে দেখেছেন সনাতন বেরার ভিটে থেকে মোহর তুলেছেন আপনার বাবা, ঘটনাটা একবার ওঁর মুখ থেকে শোনা দরকার। সত্যি-মিথ্যেটা যাচাই করার চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, দেখি। অন্য কারও গেস্ট বানিয়ে ওঁর কাছে আপনাকে পাঠানো যায় কি না আপনাদের," বলেছিলেন সুশোভনবাবু।

এলাহি লাঞ্চ সারা হল ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। ঝিনুকদের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন বলাইবাবু, ডাক্তারবাবু এবং আর্য। শ্বেতপাথরের বিশাল টেবিলে প্রত্যেকের জন্য সাজানো অজস্র পদ। ডাল-ভাত ছাড়া আর দুটো আইটেমের নাম হয়তো জানত ঝিনুক। বাকি সব জানল দীপকাকুর কথা থেকে। উনি একটা করে পদ খাচ্ছিলেন আর নাম বলে উঠছিলেন। খাওয়া তদারকি করতে থাকা আর্যর মা-কাকিমা আশ্চর্য হচ্ছিলেন ভীষণ! ডাক্তারবাবু ওঁদের জানালেন, দীপকাকুর আদিবাড়ি মেদিনীপুরেই, তাই পদগুলো ওঁর এত চেনা।

দেশের বাড়ির লোক জেনে আর্যর মা-কাকিমা উৎসাহিত হলেন, আপন লোকের মতো দীপকাকুকে খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিলেন। দীপকাকু তখন খাওয়া নিয়ে এতই মশগুল, দেখে বোঝার উপায় নেই উনি এখানে তদন্ত করতে এসেছেন না নিমন্ত্রণ খেতে।

খাওয়াদাওয়ার মাঝপথে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক ভদ্রলোক। ডাক্তারবাবুর কথা থেকে বোঝা গেল, উনিই ডেকে পাঠিয়েছেন। ভদ্রলোকের উদ্দেশে সুশোভনবাবু বললেন, "যাক, তুমি এসে গিয়েছ। ফোনেই তোমাকে কাজটার কথা বলতে পারতাম। বাড়িতে ডাকলাম আমার এই অতিথিকে ভাল করে দেখে নেওয়ার জন্য। এঁদের তোমার অতিথি বলে নিয়ে যেতে হবে বিষ্ণুকাকার বাড়ি। বলবে এঁরা মোগলমারির বিষয় সবিশেষ জানতে চান। আমি যদি পাঠাই, বিষ্ণুকাকা এঁদের বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।"

"আমি নিয়ে গেলেও কোনও সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বাবার সঙ্গে দেখা করানোর আগে বড় ছেলের থেকে পারমিশন নিতে হবে। আর সলিল যে কতটা পাজি লোক, তা তুমি ভাল করেই জান। হাজারটা প্রশ্ন করবে আমায়," বলেছিলেন ভদ্রলোক।

একটু ভেবে নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, "তা হলে এক কাজ করা যাক, তুমি একবার সলিলকে ফোন করো। বলো এঁদের নিয়ে যাচ্ছ। যদি আপত্তি করে, দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হবে না।"

"সেই ভাল," বলে ঘর থেকে বেরতে যাচ্ছিলেন মানুষটি, ডাক্তার পিছু ডাকেন, "দাঁড়াও স্বপন। এঁদের, মানে যাঁরা এখন তোমার গেস্ট, নামধাম জেনে নাও।"

"হ্যাঁ, তাই তো," বলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন স্বপন। পরিচিত হওয়ার পর জানা গেল পুরো নাম স্বপন মিশ্র। এই গ্রামেরই প্রাইমারি স্কুলের টিচার। ডাক্তারবাবু ঝিনুকদের নামধাম বললেন। দীপকাকুর পেশাটা বললেন না। ইতিহাসের অধ্যাপকের পরিচয় দিলেন।

ডাইনিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্বপন মিশ্র। যখন ফিরলেন ঝিনুকদের খাওয়া শেষের মুখে। বিমর্ষ মুখে বললেন, "রাজি তো হলই না। আমাকে যা-তা কথা শোনাল।"

"কী বলল?" কৌতূহলের গলায় জানতে চান সুশোভন।

স্বপনবাবু বলেন, "সলিল বলে কিনা, 'কেন বাজে কথা বলছ কাকা, ওই দু'জন তো তোমার গেস্ট নয়। বসুবাড়ির গেস্ট। ডাক্তারকাকা কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনিয়েছে। মেয়েটা অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওদের বাগান কারা খুঁড়েছে, সেটার ব্যাপারে তদন্ত করাতে চান। ওদের বলে দাও আমরা ও বাড়িতে ঢুকিনি। ঢোকার কোনও প্রবৃত্তি নেই। যারা এই গ্রামের গর্ব বৌদ্ধ মহাবিহারের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে, তাদের বাড়িতে পা রাখতে রুচিতে বাঁধে আমাদের।' "

ডাইনিং পুরোপুরি নিস্তব্ধ। ঘরে এত ক'টা লোক বোঝার উপায় নেই। নীরবতা ভেঙেছিলেন সুশোভনবাবু, বিষণ্ণ গলায় বললেন, "কে ওদের এত খবর দিল! গোয়েন্দা আনাচ্ছি, বাড়ির ক'টা লোকই তো শুধু জানে। কেউ যে আসছে, একথাও আমি বাইরের কাউকে বলিনি। বিহারের ঢিবি দেখতে গিয়ে আপনি কি নিজের পরিচয় দিয়েছেন?"

প্রশ্নটা দীপকাকুর উদ্দেশে। কিন্তু উনি কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। শূন্যে দৃষ্টি ভাসিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নটি হয়তো শুনতেই পাননি। ঝিনুক দীপকাকুর হয়ে বলে উঠেছিল, "আমি সারাক্ষণ ওঁর সঙ্গে ছিলাম। পরিচয় দেওয়ার মতো পরিস্থিতি আসেনি।"

আর্য বেশ রাগের গলায় বলল, "এত অপমান মেনে নেওয়া যায় না। বাবা, তুমি ওদের ফোন করে এমন কড়া-কড়া দাও, যেন ভিতরবার এরকম কথা বলার সাহস না করে।"

"ভাল হবে না। ওরা তো আজ থেকে এরকম ব্যবহার করছে না, এই অ্যাটিটিউড ওদের অনেকদিনের," বললেন ডাক্তারবাবু।

বলাইবাবু মন্তব্য করেছিলেন, "এ তো সেই 'ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি'র মতো শোনাচ্ছে। আমার তো মনে হয় বাগান ওরাই খুঁড়িয়েছে, সাফাই গাইছে আগে থেকে।"

আর্য ফের বলে উঠেছিল, "আমি কিন্তু ছাড়ব না। রাস্তাঘাটে সলিলকাকাকে পেলে লোকজনের মাঝে যা-তা বলে দেব। ওরা ভেবেছে কী, সব সময় ভাল ব্যবহার করে যাব আমরাই?"

"তুই এত মাথা গরম করিস না আর্য। বড়রা কী ঠিক করে, সেটা ছাখ আগে," এটা বলেছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। আরও কিছুটা সময়ের পর দীপকাকু ধ্যানভাঙা গলায় বলে উঠলেন, "আচ্ছা, সনাতন বেরার সঙ্গে একবার কথা বলা যায় তো? সে তো ঘটনার দিন কাছাকাছিই ছিল মোহর পাওয়া নিয়ে দুই বন্ধুর বিবাদের দিন।"

"সনাতনের সঙ্গে এখন কথা বলা কোনও কাজ। গরু কিছুই শোনে না। সময় থাকতে ঠিকমতো চিকিৎসা করাল না বাড়ির লোক," বলেছিলেন সুশোভনবাবু।

খাওয়া ছেড়ে উঠতে-উঠতে দীপকাকু বলেছিলেন, "তা হলে ওই স্পটটা অন্তত একবার দেখি। মানে সনাতন বেরার ভিটে। আপনি সঙ্গে কোনও একজনকে দিন।"

"আমি যাব," বলে উত্তেজনায় হাত তুলে ফেলল আর্য।

ডাক্তারবাবুর গাড়িতে চেপে বেরিয়েছিল ঝিনুকরা, সনাতন বেরার ভিটে দেখে এই বাংলোটায় আসবে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন সেই শ্যামল বারিক, যিনি ঝিনুকদের নিয়ে এসেছিলেন স্টেশন থেকে। আর্য আবদার করেছিল ড্রাইভ করবে। ডাক্তারবাবু অ্যালাও করেননি। বলেছিলেন, "তোর হাত এখনও পাকেনি। বাংলো যেতে গেলে হাই রোড ধরতে হবে।"

সনাতন বেরার ভিটে পর্যন্ত গাড়ি অবশ্য যায়নি। সরু মেঠো রাস্তা। তুলনামূলক চওড়া রাস্তায় গাড়ি রেখে শ্যামল বারিক সমেত যাওয়া হয়েছিল সনাতন বেরার ভিটেতে। যেখানে মোহর পাওয়া গিয়েছিল বলে দাবি করছেন বিষ্ণু মাইতি, সেখানে এখন ইটের পাঁচিল। বাড়িটাও পাকা, টিনের ছাউনি। দীপকাকু একটু বুঝি হতাশ হলেন। বলেছিলেন, "ডাক্তারবাবুর কথা শুনে মনে হয়েছিল এদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, এ বাড়ি তা প্রমাণ করছে না।"

"অবস্থা সত্যিই সুবিধের ছিল না। কীভাবে যেন টাকা আসতে থাকে হাতে! এদের রোজগার বলতে তো সামান্য চাষবাস। সনাতন বেরার ছোট ছেলে অবশ্য আনাজপাতির পাইকারি করে। তাতে এত টাকা করা সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষ আলোচনা করে বিষ্ণু মাইতি, ডাক্তারবাবু এই ভিটেয় খোঁজ চালিয়ে যাওয়ার পর মোহর সনাতন বেরাই পেয়েছে। খরচ করছে ধীরে-ধীরে। যাতে লোকজনের চোখে না লাগে," শ্যামল বারিক বলছিলেন কথাগুলো।

সকলে মিলে প্রদক্ষিণ করা হচ্ছিল সনাতন বেরার ভিটে। পাঁচিলটা

যখন একটা জানলার কাছে, ভিতর থেকে ভেসে এল বয়স্ক পুরুষের কণ্ঠ, "কে-কে ওখানে?"

দীপকাকু চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে শ্যামল বারিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কার গলা?"

"সনাতন বেরার," বললেন বারিক।

দীপকাকু বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "সে কী, ডাক্তারবাবু যে বললেন সনাতন বেরা কানে শোনে না! আমাদের পায়ের আওয়াজ পেল কী করে?"

অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল শ্যামল বারিককে। ডাক্তারবাবু যখন কমেন্টটা করেছিলেন উনি ছিলেন না। আর্য বলে ওঠে, "বুড়ো মাঝে-মাঝেই বেড়াল হাঁক দেয়। কিছু না শুনেই। মনে করে বাগানে কেউ ঢুকেছে। বাগানে অনেক রকম ফলমূল, শাকসবজির চাষ।"

এর পর কথার খেই ধরে নিলেন শ্যামল বারিক। বলতে থাকলেন, "পাঁচিল যখন ছিল না। বাঁশ-কঞ্চির বেড়া টপকে আমরা কতবার বাগানে ঢুকেছি। গাছে চড়ে ফল পেড়ে খেয়েছি, তখন ওরা খুব একটা কিছু বলত না। পাঁচিল তোলার সঙ্গে-সঙ্গে মনটাও ছোট হয়ে গিয়েছে। এখন সম্পত্তিটা বড্ড বেশি নিজের মনে করে।"

দু'জনের বক্তব্যে মোটেই সন্তুষ্ট হননি দীপকাকু। মুখে তার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, "এবার তা হলে ফেরা যাক।"

এই বাংলোয় ঝিনুকদের পৌঁছে দিল আর্য আর শ্যামল বারিক। গাড়িতে পনেরো মিনিট মতো লেগেছিল। মেন রোড থেকে নেমে আঁকাবাঁকা খানিকটা মেঠো পথের পর বাংলোর গেট। বিকেল তখন ফুরিয়ে আসছে। শ্যামল বারিক বলেছিল, "আপনাদের যখনই গাড়ি লাগবে, ফোন করে দেবেন, চলে আসবে। তা সে এই গাড়িই আসুক বা অন্য কোনও। ডাক্তারবাবুর ফোন নম্বর তো আপনাদের কাছে আছে। আমারটাও রেখে দিন।"

ফোন নম্বরটা বললেন শ্যামল বারিক। দীপকাকু তো বটেই, ঝিনুকও নিজের মোবাইল বার করে নাম্বারটা সেভ করে নিয়েছিল। ফিরে যাওয়ার আগে আর্য কেয়ারটেকার কার্তিক জানাকে বারবার করে বলে গেল, "এঁদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়। ভাল করে খেয়াল রাখবে।"

ঝিনুকদের জন্য দুটো ঘর ঠিক করে রেখেছিল কার্তিক জানা। দীপকাকু বেছে নিলেন ঘর। ঝিনুককে বলেছিলেন, "আমি ধারের ঘরটায় থাকি, বাইরের দিকে বড় দুটো জানলা, কেউ যদি আমাদের কোনও রকম অনিষ্ট করতে চায়, ওই দিক থেকেই করবে। মাঝের ঘরটা সেফ। একটাই জানলা, সামনে গ্রিল-ঘেরা বারান্দা। তোমার জন্য তাই মাঝের ঘর।"

নিজের ঘরে ঢুকে বাইরের ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছিল ঝিনুক। শরীরে প্রবল ক্লান্তি। দীপকাকুর নির্দেশে কার্তিক জানা চা আর কফি বানিয়ে ফেলল। কফি ঝিনুকের জন্য। দু'জনে মিলে চা-কফি খাওয়া হল বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসে। দীপকাকু উদাসভাবে বাংলোর গেটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল সামনে লালমাটির রাস্তা বা গাছপালা উনি দেখছেন না। সুশোভনবাবুর কেসটা নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন। এর মাঝে একবার শুধু বলে উঠলেন, "এখানে পৌঁছনো সংবাদ ফোন করে জানিয়েছে বউদিকে?"

"মাকে ফোন করা হয়নি। বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছি," বলেছিল ঝিনুক।

চা শেষ করে দীপকাকু ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। বললেন, "লোকাল থানায় ঘুরে আসি। আলাপ সেরে রাখি। কখন কী দরকার পড়ে।"

"আমি কি যাব সঙ্গে?" জিজ্ঞেস করেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বলেছিলেন, "নাহ, তুমি রেস্ট নাও। থানা কাছেই, আসার পথে দেখলাম। আমি এখনই ঘুরে আসছি।"

'এখনই' বলে দীপকাকু প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে ফিরলেন। দেরি দেখে ফোন করলে দীপকাকু বিরক্ত হন, ঝিনুক তাই খবর নিতে পারেনি। এখনও যেমন পারছে না। সাতসকালে কোথায় যে গেলেন, কী করছেন, কে জানে!

দীপকাকু থানার উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবাকে ফোন করেছিল ঝিনুক। হোয়াটসঅ্যাপের উত্তরে বাবা লিখেছিলেন, 'কেসটা বুঝে নিয়ে আমাকে সময় করে জানাবি।'

সারাটা দিন যা-যা ঘটেছে বাবাকে ফোনে বলেছিল ঝিনুক। সমস্তটা শুনে বাবা বললেন, "দীপঙ্কর এর আগে এত বড় রেঞ্জের কেস পায়নি। বোঝাই যাচ্ছে আর্কিয়োলজিকাল আইটেমের ইন্টারন্যাশনাল পেডলাররা জড়িয়ে আছে কেসটায়। গণ্ডামোর বেশ এদের টেস করা ভীষণ কঠিন। শহরের মতো হাতের কাছে পুলিশ বা প্রযুক্তির কোনও সাহায্যই পাওয়া যাবে না।"

ঝিনুক সহমত। এত বড় কেসটা দীপকাকু কী করে সামলাবেন, ভেবে পাচ্ছে না। ফোন ছাড়ার আগে প্রতিবারের মতো বাবা বলেছিলেন, "কেসের প্রোগ্রেস আমাকে টাইম টু টাইম জানাবি।"

থানা থেকে যখন ফিরেছিলেন দীপকাকু, বেশ চনমনে দেখাচ্ছিল। বারান্দার চেয়ারে রিল্যাক্সড হয়ে বসে বললেন, "এখানকার পুলিশ টিম বেশ ভদ্র। যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করল আমার সঙ্গে। যদিও তার আগে কলকাতা পুলিশের কয়েকজন বড় অফিসারের রেফারেন্স দিতে হল, আগে যাঁদের সাহায্য নিয়েছি আমার তদন্তে।"

ঝিনুক বলেছিল, "থানায় এত সময় লাগল কেন? আরও কোথাও গিয়েছিলেন না কি?"

তক্ষুনি উত্তর না দিয়ে দীপকাকু ঝিনুককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই এখন আর কফি খাবে না। আমার জন্য একটা লিকার চা বলে এসো তো।"

ঝিনুকের চায়ের নেশা নেই, কফি কখনওসখনও খায়। কিচেনে গিয়ে দীপকাকুর জন্য চা বলে এসেছিল। কার্তিক জানা তখন ডিনারের রান্নায় ব্যস্ত। ঝিনুক চেয়ারে ফিরতে দীপকাকু আগের প্রসঙ্গে গেলেন। বলেছিলেন, "থানাতেই ছিলাম এতক্ষণ। শুধু গল্পগাছা করিনি। এখানকার অপরাধজগৎ সম্বন্ধে জানলাম। ওঁরাও বললেন বেশ ক'টা গ্রাম জুড়ে প্রক্সবল্ড পাচারচক্র এখানে ভালমতেই সক্রিয়। যাদের মধ্যে দু'-তিনজনকে তাঁরা অ্যারেস্টও করেছেন। ছেড়ে দিতে হয়েছে প্রমাণের অভাবে। নাম-ঠিকানা নিলাম তাদের। পুলিশের কয়েকজন সোর্সের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। দু'জনকে ডেকে পাঠালেন থানায়। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'বাইরের লোকজন এখানে ঘোরাঘুরি করছে কি না?' ওরা বলল, 'ছ'জনের একটা টিম অনেকদিন ধরেই এখানকার গ্রামগুলোয় ঘোরাফেরা করছে। এসেছে হয়তো কলকাতা বা তার আশপাশের শহর থেকে। একসঙ্গে খঞ্জপুরে এক মেসে থাকে। গ্রামে এসে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই বাঙালি।'"

কথা থামাতে হয়েছিল দীপকাকুকে। চা নিয়ে এসেছিল কার্তিক জানা। চায়ে চুমুক দিয়ে দীপকাকু চলে গেলেন অন্য কথায়। বলেছিলেন, "এই কেসটা নিয়ে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো? তোমার অবজার্ভেশনটা শুনি।"

ঝিনুক বলেছিল, "প্রথমত গ্রাম নিয়ে অভিজ্ঞতা আমার নেই। এখানকার পরিবেশ অচেনা। আর্কিয়োলজি সাবজেক্টটাতেও আমার তেমন দখল নেই। কেসটা বুঝে উঠতেই সময় লাগছে। গুছিয়ে কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। তবে জানছি অনেক নতুন বিষয়।"

"মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছে, সেগুলো বলে ফেলো," বলেছিলেন দীপকাকু। নিজের ভাবনা-চিন্তা ঠিক পথে যাচ্ছে কি না যাচাই করতে প্রত্যেক কেসে এই ধরনের আলোচনা ঝিনুক অথবা বাবার সঙ্গে বসেন দীপকাকু। প্রশ্নগুলো মাথায় ক্রমানুসারে সাজাচ্ছিল ঝিনুক। দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "নোট রেখেছ কিছু?"

"না, নোট সেভাবে নেওয়া হয়নি। প্রশ্নগুলো মনে করে রেখেছি। এবার লিখে নেব। কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, বিষ্ণুবার্থ কী তাঁর বলছেন? মোহর কি আদৌ পাওয়া গিয়েছিল? নাম্বার টু, মোহর যদি পাওয়াও যায়, সেটা ক'টা? চারযুগ কি? নাম্বার থ্রি, আদৌ কি আর্যর

দাদুর স্টাডিতে কেউ কিছু খোঁজে? নাকি ওটা প্রবোধবাবুর মনের ভুল? নাম্বার ফোর, বাগান কি চারঘড়া মোহর পাওয়ার জন্যই খুঁড়া হয়েছে? নাকি ওখানে অন্য কোনও প্রত্ননিদর্শনের খোঁজ পেয়েছে কেউ?"

"ওয়েল সেড। এই পয়েন্টটা আমার মাথায় আসেনি," প্রশংসার গলায় বলে উঠেছিলেন দীপকাকু। কথার সূত্র ধরে উনিই বলতে থাকলেন, "প্রত্নবস্তুর খোঁজ পেতেই কি সে প্রবোধবাবুর স্টাডির কাগজপত্র ঘাঁটছিল? কারণ, এই এলাকার মাটির নীচে কী আছে, প্রবোধবাবুর চেয়ে ভাল কেউ জানে না। বাগান খুঁড়ে কিছুই পেল না দুষ্কৃতী অর্থাৎ প্রবোধবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে যে তথ্য সে পেয়েছিল, তা ভুল ছিল অথবা তথ্যটা সুনির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, পুরাবস্তুর খোঁজ যদি প্রবোধবাবুর স্টাডিতে থাকে, তিনি নিজেই সেই জিনিসটা মাটি থেকে তুললেন না কেন? এই অঞ্চলে প্রত্নবস্তু উদ্ধারের কাজে তাঁর আগ্রহ সবার চেয়ে বেশি। নিজের বাগানের তলায় থাকা পুরানিদর্শন তুলবেন না! এমন তো হওয়ার কথা নয়, যে তিনি সেই নিদর্শন চোরাবাজারে বিক্রি করে দেবেন বলে জিনিসটা মাটি থেকে তোলেননি। তিনি বহু মূল্যবান আর্কিয়োম্যাটার গ্রামের আনাচকানাচ থেকে উদ্ধার করে মিউজিয়ামে পাঠিয়েছেন।"

কথার মাঝে-মাঝে চামুক মেরে কাপ শেষ করলেন দীপকাকু। কাপটা ফ্লোরে নামিয়ে বলেছিলেন, "চারঘড়া মোহর পেলে অবশ্য রেখে দিতেই পারেন। কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার। প্রবোধবাবুর পরবর্তী চারপুরুষ বসে খাবে। চোরাবাজারে বিক্রি করতেও যেতে হবে না। সোনার দোকানে গিয়ে প্রয়োজনমতো একটা করে ভাঙিয়ে নেওয়া যাবে। চারঘড়া মোহর ব্যাপারটাই আমার কেমন অবাস্তব লাগছে।"

এ কথার পরই বিনুক সুযোগ পেয়েছিল নিজের পর্যবেক্ষণশক্তির প্রমাণ দিতে। বলেছিল, "আমি জানি চারঘড়া মোহরের ব্যাপারটা আপনার কেন আজগুবি মনে হচ্ছে। আপনি ভাবছেন যে প্রত্নক্ষেত্রে বেশির ভাগই মাটির পাত্র আর কিছু পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দামি বলতে একটা মুদ্রা, সেটাও আবার মিশ্র ধাতু, সোনার বলতে একটা লকেট, সেখানে চারঘড়া মোহর আসবে কোথা থেকে? কিন্তু এটাও খেয়াল করতে হবে, ওখানেই পাওয়া গিয়েছে পঁচানব্বইটা ব্রোঞ্জের মূর্তি। লুঠনের ভয়ে একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকনো ছিল। ঠিক একই কারণে চারঘড়া মোহরও লুকনো থাকতে পারে।"

বিনুককে হতাশ করে দীপকাকু বলেছিলেন, "আরে বাবা, ওই লজিক আমার মাথাতেও এসেছে। ওটা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার কথা হল, ওই চারটে ঘড়া একসঙ্গে না হলেও একটা-একটা করে যদি নিজের বাগানে এসে পুঁতে থাকেন প্রবোধবাবু, ঘটনাটা কারও চোখে পড়বে না? যদি রাতের বেলাতেও আনেন, কোনও না-কোনও সাক্ষী থাকবে। শহরের মতো গ্রামের মানুষজন অত দেরি এঁটে ঘুমোয় না। চাষবাস পাহারায় কিছু লোক জেগে থাকে। সেরকম কোনও সাক্ষীর কথা তো উঠে আসছে না। যে লোকটা বিষ্ণু মাইতির অভিযোগকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারত। এমনকী, সে বিষ্ণু মাইতিকে প্রথম থেকেই বলতে পারত, চার-পাঁচটা মোহর নয়, মোহরের ঘড়া পেয়েছেন প্রবোধবাবু। সেরকম কোনও সাক্ষীর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না কেন?"

"সাক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে হয়তো," বলেছিল বিনুক।

দীপকাকু বললেন, "সরিয়ে দেওয়া বলতে তুমি মেরে ফেলার কথা বলছ তো? প্রবোধবাবুর বিষয়ে যতটুকু যা জেনেছি, কাউকে খুন করার মতো কাজ ওঁর ক্ষেত্রে বেমানান। তা ছাড়া এই ফাঁকা গ্রামাঞ্চলে সাক্ষী একাধিক হতে পারে। ক'জনকে খুন করবেন প্রবোধবাবু? রাতের অন্ধকারে ক'জন সাক্ষী রইল, প্রবোধবাবুর জানার কথা নয়।"

"তা হলে কি ঘড়াগুলো পেয়েছে সনাতন বেরা? বিষ্ণুবাবু, প্রবোধবাবু স্পট থেকে ফিরে যাওয়ার পর আরও গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে ছিল? তারপরই বিশাল প্রাপ্তি," সম্ভাবনাটার কথা তুলেছিল বিনুক।

ভর্ৎসনার স্বরে তা বাতিল করে দিয়েছিলেন দীপকাকু। বলেছিলেন, "প্রাপ্তি যদি হবে সনাতন বেরার, 'চারঘড়া' কথাটা প্রবোধবাবুর মুখে উঠে আসবে কেন? ছেলেকে সাবধান করলেন, মোহরের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। প্রলাপ যদি হয়ও, কথাটা কিন্তু উনিই বলেছেন।"

যুক্তিতে কোনও ফাঁক নেই। বিনুককেও তাই কিছু বলার ছিল না। কপাল কুঁচকে ফের দীপকাকুই বলতে থাকলেন, "আমার কেন যেন সুশোভনবাবুকে নিয়েই ধন্দ তৈরি হচ্ছে। খটকাটা লাগল তখন থেকে, উনি বলেছিলেন সনাতন বেরা কানে প্রায় শুনতেই পায় না, অথচ আমরা দেখলাম পায়। আর্য ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করল, সর্পকে গাল খাড়া করল শ্যামল বারিক। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। সন্দেহ আরও বেড়েছে, সুশোভনবাবু চান না আমি সনাতন বেরার সঙ্গে কথা বলি। কেন চান না? সনাতন কি এমন কোনও গোপন তথ্য জানে। যা আমার জেরায় বেরিয়ে এলে ফলস্ প্যোজিশনে পড়ে যাবেন সুশোভনডাক্তার? সেই তথ্য গোপন রাখার জন্য মোটা অ্যামাউন্টের টাকা দেওয়া হয়েছে সনাতন বেরাকে? সেই কারণেই হয়তো অবস্থা ফিরেছে ওদের সংসারে।"

"সুশোভনবাবুদের কোন দুর্বলতার কথা জেনে থাকতে পারে সনাতন বেরা?" কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল বিনুক।

দীপকাকু উত্তর দিলেন দেরিতে। বলেছিলেন, "ডাক্তারবাবু আর সনাতন বেরার সামাজিক অবস্থানের মাঝে বিস্তর ফারাক। সুশোভনডাক্তারের কোনও দুর্বলতার কথা সনাতন বেরার জানার কথা নয়। শুধু এক বিশেষ ঘটনায় দুই স্টেটসের লোক এক জায়গায় এসেছিল। আমি এখানে ডাক্তারবাবুর বাবা আর সনাতন বেরার কথা বোঝাচ্ছি। সনাতন বেরার ডাকে ওর ভিটের নীচে স্তূপ আছে কি না দেখতে এসেছিলেন প্রবোধবাবু। বিষ্ণু মাইতিও ছিলেন। দুই বন্ধুর ঝগড়া হয়। আরও কী-কী হয়, তার সাক্ষী সনাতন বেরা। সে হয়তো দেখে থাকতে পারে ঝগড়ার পরের দিন প্রবোধবাবু স্পটে এসে কিছু খোঁজখুঁজি করছেন। কিছু সংখ্যক মোহর কিংবা ঘড়ভর্তি মোহর যদি নাও তুলতে দেখে সনাতন বেরা, প্রবোধবাবু যে পরে ওই স্থানে গিয়েছিলেন, এ কথা গ্রামের লোককে বলে দিলে, তাতেই এলাকাবাসী বিষ্ণু মাইতির অভিযোগকে সত্য বলে ধরে নেবে। তাই সনাতনের মুখ বন্ধ রাখতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে থাকতে পারেন প্রবোধবাবু।"

বিনুক বলেছিল, "সনাতন বেরা নিশ্চয়ই ওর ভিটে থেকে প্রবোধবাবুকে ঘড়া তুলে দিয়ে যেতে দেখেনি। নিয়ে যেতে দিতও না। অন্য প্রত্নবস্তুর মূল্য না বুঝলেও, চারঘড়া মোহরের মানে সে বোঝে।"

"একদম ঠিক," বলার পর দীপকাকুর ভ্রূ যুগল কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কেটে-কেটে বলেছিলেন, "আমাকে তদন্ত করতে ডেকে পাঠানোটা আইওয়াশ নয় তো? ডাক্তারবাবু হয়তো এলাকাবাসীর চোখে ধুলো দিতে চাইছেন।"

"ঠিক বুঝলাম না," বলেছিল বিনুক।

উত্তরে দীপকাকু বলতে থাকলেন, "ডাঃ সুশোভন হয়তো জানেন বাবা মোহর পেয়েছেন, কোথায় রাখা আছে সেটাও বোধ হয় ওঁর অজানা নয়।"

বিনুক বলে উঠেছিল, "প্রবোধবাবু তো বলছেন স্তূপে আছে চারঘড়া মোহর। মানে যেখান থেকে তুলেছেন, সেখানেই রেখে দিয়েছেন। এরকম মহার্ঘ সম্পদ বাড়ির বাইরে অরক্ষিত অবস্থায় রাখবেন কেন? এদিকে ডাক্তারবাবু আবার বলছেন সনাতন বেরার ভিটেতে কোনও স্তূপ পাওয়া যায়নি।"

"হতে পারে আমার অনুমান ভুল। প্রবোধবাবুর 'ধূপ' উচ্চারণের সঙ্গে অন্য কোনও শব্দের মিল আছে। কোন শব্দ মানে জায়গা, সেটা সম্ভবত জানেন সুশোভন, জানে আর্যও, তাই 'ধূপ' শব্দটার মানে সমর্থনসূচক, 'ঠিক-ঠিক' শব্দে বদলে দিয়েছিল," বলেছিলেন দীপকাকু।

বিনুক জানতে চাইল, "আপনাকে এনে আইওয়াশের প্রয়োজন পড়ছে কেন?"

"পড়ত না। বিষ্ণুবাবুর অভিযোগ প্রবোধবাবু এবং ডাক্তারবাবু সমাজনেবা করে ভালই সামলে নিয়েছিলেন। সমস্যা তৈরি হল প্রবোধবাবুর স্মৃতিভ্রংশের কারণে। উনি নিজের মুখে চারদাড়া মোহরের উল্লেখ করছেন। বিব্রত ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছেন সুশোভনডাক্তার। পুরনো অভিযোগ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ডাক্তারবাবু তাই নিজেই বাগানের মাটি খুঁড়িয়ে কলকাতা থেকে গোয়েন্দা ডেকে পাঠিয়েছেন। একটা প্রেক্সাপট তৈরি করেছেন তদন্ত করার মতো," বলার পর প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে ছিলেন দীপকাকু।

ওঁর শেষ কথাগুলো তলিয়ে ভেবে ঝিনুক বলেছিল, "উনি বাগান খোঁড়ানোর কী করে? সপরিবারে ডাক্তারবাবু তো তখন দিঘায়।"

"ওটাও একটা পরিকল্পনায় অঙ্গ। বাগান খোঁড়ার দায়িত্ব কাউকে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে। ওটা যে দুষ্কৃতীদের কাজ এই ধারণাটা এলাকাবাসীর মনে যাতে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়," বলার পর একটু থেমে ফের দীপকাকু বলেছিলেন, "একটা ব্যাপার তো আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। রাতে অনেকটা সময় জুড়ে বাগান খোঁড়া হল, অথচ কাজের লোক দু'জন কিচ্ছুটি টের পেল না। এত গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছিল ওরা?"

"হয়তো নেশা করে শুয়েছিল," বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "নেশাও যদি করে, ঘুমোবে কিন্তু পালা করে। কারণ, ওদের উপর বাড়ি পাহারার দায়িত্ব ছিল," বলে একটু থামলেন দীপকাকু। ফের বলতে থাকলেন, "আমার মনে হচ্ছে কাজের লোক দু'জনের সঙ্গে গট আপ করেছেন ডাক্তারবাবু। বাগান ওরাই খুঁড়েছে, ফোনে করে ডেকে পাঠানোটাও ডাক্তারবাবুর নির্দেশেই করেছে। সবই সুশোভনডাক্তারের সাজানো নাটক।"

গোটাটা শোনার পর কিছুক্ষণ থম মেরে বসেছিল ঝিনুক। ভোঁভোঁ করছিল মাথা। দীপকাকুর অ্যানালিসিস ভয়ংকর রকমের জটিল হয়ে থাকে, যার সঙ্গে তাল রাখা সহজ কাজ নয়। নিজেকে একটু থিতিয়ে নিয়ে ঝিনুক বলেছিল, "এখনও কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। আপনি যে গোয়েন্দা, এই খবরটা বিষ্ণু মাইতির ছেলে জানলেন কী করে?"

"ডাক্তারবাবুই জানিয়েছেন অন্য কারও মাধ্যমে। গ্রামের আরও অনেক মাথাকেই জানিয়েছেন একইভাবে, ওদের কাছেই তো প্রমাণ করতে চান তাঁর জিম্মায় কোনও প্রত্নসম্পদ নেই। তাই গোয়েন্দা ডাকার সাহস দেখাচ্ছেন," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলেছিল, "এ তো সেই ডিটেকটিভ গল্পের মতো হয়ে গেল। যে অপরাধী সে নিজেই তদন্ত করাতে গোয়েন্দা ডেকে পাঠাচ্ছে। এরকম প্লট বহুবার ব্যবহার হয়েছে গোয়েন্দাকাহিনিতে।"

"আমাদের কেসটা তো আর কোনও উপন্যাস নয় যে, একই জিনিস বারবার ঘটলে পুরনো হয়ে যাওয়ার ভাবনায় আর ঘটবে না। এটা ঘোর বাস্তবের কেস," বেশ মিচকি-মিচকি হাসছিলেন দীপকাকু। এরকম জটিল তদন্তে মাথা গলিয়ে কী করে যে এমন হাসতে পারেন, কে জানে!

এর পরই বড়সড় একটা আড়মোড়া ভেঙে দীপকাকু বলেছিলেন, "এতক্ষণ যা-যা কথা হল, রুমে গিয়ে পয়েন্ট ওয়াইজ নোট করে রাখো। পরে একটা-দুটো পয়েন্ট মিস করে যেত পারি। ধরিয়ে দিয়ো। ঘণ্টাখানেক নিউজ চ্যানেল দেখি গিয়ে, তারপর ডিনার সারব। ঘুমটা আজ জব্বর হবে, যা ঘোরাঘুরি গেল।"

কোথায় ভাল করে ঘুমোলেন দীপকাকু! সাতসকালে উঠে পড়ে ঝিনুককে একবার মাত্র ডেকেই চা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, এবার নিশ্চয়ই দীপকাকুকে একটা ফোন করা যায়। হাতে থাকা ফোনসেট চোখের সামনে আনে ঝিনুক, তখনই দেখে বাজারের ব্যাগ নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসছে কেয়ারটেকার কার্তিক জানা। কেনাকাটা সারতে গিয়েছিল। কার্তিক জানা গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "ব্রেকফাস্ট দেব দিদিমণি?"

"এখনই না। ওঁর জন্য আর একটু ওয়েট করি।"

ঘাড় হেলিয়ে বারান্দায় উঠে এল কার্তিক জানা, এগিয়ে গেল কিচেনের দিকে। ঝিনুক ফোন তুলে দীপকাকুর নামে কল করে। রিং হয়ে যাচ্ছে। তুললেন না ফোন। হয়তো ব্যস্ত আছেন বা এমন কোথাও আছেন, কানে যাচ্ছে না রিংয়ের আওয়াজ। মিনিটপাঁচেক অপেক্ষা করা যাক। একটা প্রশ্ন মাথায় আসে ঝিনুকের। চেয়ার ছেড়ে কিচেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। কার্তিক জানা রান্নার কাজে ব্যস্ত। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, উনি যখন বেরলেন, কোনও গাড়ি নিতে এসেছিল কি?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্তিক জানা বলে, "না। কোনও গাড়ি আসেনি তো। উনি পায়ে হেঁটেই এগিয়ে গেলেন।"

গাড়ি যখন আসেনি দীপকাকু নিশ্চয়ই বড় রাস্তায় গিয়ে বাস বা অন্য কোনও গাড়ি ধরেছেন। কোথায় যে গেলেন! চিন্তায় পড়ে যায় ঝিনুক। চেয়ারে ফিরে এসে আবার কল করে দীপকাকুকে। আগের মতোই রিং হয়ে যাচ্ছে, ধরছেন না। কল কেটে যাওয়ার আগের মুহূর্তে একটা অচেনা পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, "কে বলছেন?"

ঝিনুক তো অবাক! ঝাঁঝের গলায় বলে ওঠে, "আপনি কে? এটা তো আমার কাকার ফোন।"

"কার ফোন জানি না। একজন আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। মারা গিয়েছে। অজ্ঞান, বুঝতে পারছি না। বডির পাশেই পড়েছিল ফোন। রিং হচ্ছিল। ধরলাম।"

ডানহাত ধর ধর করে কাঁপছে ঝিনুকের, ফোনসেট ঠিক মতো ধরে রাখতে পারছে না কানে, বলে ওঠে, "প্লিজ আপনি ওঁকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

"ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে, আগে পুলিশ ডাকবে তারপর চিকিৎসা। আমি ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে যাব। পুলিশ আমায় প্রচুর কোশ্চেন করবে।"

লোকটার উচ্চারণ শুনে বোঝা যাচ্ছে এখানকারই কোনও সাধারণ লোক। ঝিনুক বলে, "আমি পুলিশের ব্যাপারটা দেখছি, আপনি এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে যান ওঁকে নিয়ে। জায়গাটা কোথায়? যেখানে পড়ে আছেন উনি?"

"মোগলমারি টিবির কাছে," বলে ফোন কেটে দিল লোকটা।

॥ ৩ ॥

ঝিনুক এখন ডাঃ সুশোভন বসুর চেম্বারে। দীপকাকুর অবস্থা তেমন মারাত্মক নয়। পেশেন্টদের পরীক্ষা করার বেডে চোখবুজে শুয়ে আছেন।

যে লোকটা ফোন ধরেছিল, দীপকাকুকে এখানে নিয়ে এসেছে সে। সঙ্গে অবশ্য শ্যামল বারিকও ছিলেন। লোকটা ফোন কাটার পরই ঝিনুক শ্যামল বারিককে কল করে। ভাগ্যিস উনি নিজের নম্বরটা দিয়ে গিয়েছিলেন আগের দিন। ঝিনুকের থেকে ঘটনাটা জেনে শ্যামল বারিক বলেছিলেন, "আমি এখনই টিবির আশপাশে ঘুরে দেখছি কোথায় আছেন। কী অবস্থায় আছেন।"

তারপর আর ফোন করেননি বারিকবাবু। আর্য গাড়ি নিয়ে ঝিনুককে নিতে এসেছিল। সে প্রথম জানালে প্রকৃত ঘটনা, কেউ একজন দীপকাকুর মাথার পিছনে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কাকু। সৌভাগ্যক্রমে চোট সিরিয়াস নয়। যে লোকটি ঝিনুকের ফোন ধরেছিল, সনাতন বেরার মেজছেলে, প্রতাপ বেরা। উপড়ু অবস্থায় দীপকাকু পড়েছিলেন ওদের বাড়ির খানিকটা আগে। ফোনের রিং শুনে বেরিয়ে এসেছিল প্রতাপ। ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে প্রথমে দীপকাকুকে চিৎ করে চোখেমুখে জলের ছিটে দেয়। তখনই জ্ঞান ফেরে দীপকাকুর, তবে কথা বলা বা হাঁটাচলার অবস্থায় ছিলেন না। প্রতাপ বেরা নিজের কাঁধে দীপকাকুর এক হাত জড়িয়ে সুশোভনডাক্তারের চেম্বারের উদ্দেশেই রওনা দিয়েছিল। মোটরবাইকে চেপে সেখানে উপস্থিত হন শ্যামল বারিক। ওই বাইকে চাপিয়েই দীপকাকুকে নিয়ে আসা হয় এখানে।

boiRboi.blogspot.com

লাঠির আঘাতে মাথা না ফাটলেও, সুরকির রাস্তায় আছাড় পড়ার কারণে সামান্য কেটে-ছেঁচড়ে গিয়েছে মাথা-কপাল। ডাক্তারবাবু ড্রেস করে দিয়েছেন সে সব। দীপকাকুর মাথায় এখন ব্যান্ডেজের ফেট্টি। বেডের পাশে চেয়ারে বসা বিনুকের চোখ মাঝে-মাঝেই চলে যাচ্ছে দীপকাকুর বুকের দিকে, ওঠানামা করছে তো? অথচ ডাক্তারবাবু তো বলেই দিয়েছেন দীপকাকুর আঘাত নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। হালকা ডোজের ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তবু খারাপ সম্ভাবনার দিকেই মানুষের মন ঝুঁকে থাকে।

চেম্বারে এখন বিনুকু, ডাক্তারবাবু। শ্যামল বারিক আর দীপকাকু তো আছেনই, অচেতন অবস্থায়। খানিক আগে আর্যও ছিল। কোনও কাজে বাইরে গিয়েছে। এখানে এসে থেকে প্রতাপ বেরাকে দেখেনি বিনুক। দীপকাকুকে চেম্বারের বেডে শুইয়ে দেওয়ার পর থেকেই সে বেপাত্তা। সম্ভবত পুলিশি ঝামেলা এড়াতেই। ডাক্তারবাবু অবশ্য পুলিশ ডাকেননি। বিনুকুকে বলেছেন। চোট তো তেমন গুরুতর নয়, সুস্থবোধ করার পর উনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন থানায় ঘটনাটা জানানো হবে কি না।

সাতসকালে দীপকাকু কেন সনাতন বেরার বাড়ির কাছে এসেছিলেন, আন্দাজ করতে পারছে বিনুকু। ডাক্তারবাবু চানিন দীপকাকু সনাতন বেরার সঙ্গে কথা বলুন। দীপকাকু ওঁর অলক্ষ্যে সাক্ষাৎপর্বটা সারতে এসেছিলেন। কিন্তু দীপকাকুকে মারল কে? ডাক্তারবাবুর লোকজন কি? দীপকাকু যে ও বাড়িতে যাবেন, এটা দুষ্কৃতী জানল কী করে? যেখানে বিনুকুই জানত না। তা হলে কি সনাতন বেরার মেজছেলে প্রতাপই দীপকাকুকে লাঠির বাড়ি মেরেছে আড়াল থেকে। তারপর বিনুকের দ্বিতীয় কাউকে ধরে এমন ভাব করেছে, যেন সে কিছুই জানে না। আর ঠিক এই কারণেই হয়তো পুলিশের মুখোমুখি হতে চাইছে না সে। কিন্তু দীপকাকুকে কেন মারার দরকার পড়ে তার? বুঝে উঠতে পারছে না বিনুক!

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু বিনুককে একটি মোক্ষম প্রশ্ন করেছেন, "মিঃ বাগচী একা দুম করে টিবির কাছে চলে এলেন কেন? গাড়ি চেয়ে নিলেই পারতেন। শ্যামল তো বলে এসেছিল। গাড়ি চাইলে ওঁকে একা ঘুরতে হত না। শ্যামল বা অন্য কোনও ড্রাইভার সঙ্গে থাকত।"

বিনুক বলেছিল, "একা কেন এসেছেন ঠিক বলতে পারব না। আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি। বাংলোকে থেকে যখন বেরিয়েছেন, আমি উঠিনি ঘুম থেকে।"

'উনি আমায় ডেকেছিলেন' বলে উঠতে পারেনি বিনুক। কথাটা লজ্জার এবং দীপকাকুর ডাকে না ওঠাটা কত বড় ভুল হয়েছে, সে তো এখন বোঝাই যাচ্ছে। রীতিমতো অন্যায় করেছে ডাক্তার, তা নিয়ে অপরাধবোধেও ভুগছে। সেই কারণে মুখটা হয়ে রয়েছে থমথমে। এটা লক্ষ করে শ্যামল বারিক দু'বার ঘুরিয়েফিরিয়ে একই কথা বলেছেন, "চিন্তার কিছু নেই। বড় কোনও চোট নয়। ভাগ্য ভাল যে, লাঠিটা এমন জায়গায় পড়েছে, যেখানে লাগলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। ইন্টারনাল হেমারেজের চান্স বড় একটা থাকে না।"

এর পরও বিনুকের মুখের মেঘ সরছে না দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন শ্যামল বারিক।

ইতিমধ্যে বিনুকের থেকে সামান্য কম বেশি বয়সের একটি ছেলে এবং মেয়ে দীপকাকুকে এসে দেখে গেল। ফিসফিস করে কথা সারল শ্যামল বারিকের সঙ্গে। কেউ আলাপ না করালেও বিনুকের আন্দাজ করতে অসুবিধে হয়নি, এই দু'জন আর্যর খুড়তুতো ভাইবোন।

কিছুক্ষণ হল চেম্বারে একজন-দু'জন করে পেশেন্ট আসছে। দীপকাকুর বেডের সামনের পরদাটা সরানো ছিল, রোগী আসছে দেখে অনেকটাই টেনে দিয়েছে বিনুকু। কাকি অংশটায় নিজের চেয়ার টেনে বসেছে। পেশেন্টপাটি কোনও এক রোগীকে অতঙ্কণ শোয়া অবস্থায় দেখলে ঘাবড়ে যাবে। শ্যামল বারিক, ডাক্তারবাবু দু'জনেই এখন ব্যস্ত। বারিকবাবু প্রয়োজনমতো পেশেন্টদের ব্লাডপ্রেশার মাপছেন, ইনজেকশন দিচ্ছেন। বিক্রি করছেন ওষুধ। এ গ্রামে কোনও ওষুধের দোকান নেই, বলেছেন ডাক্তারবাবু। নিজের চেয়ার-টেবিলে বসে উনিও একের পর-এক রোগী দেখে যাচ্ছেন। একেবারে নিজের লোকের মতো কথা বলছেন পেশেন্টদের সঙ্গে। দীপকাকুর অবজ্ঞাটেশন হচ্ছে, সেবার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের কাছের লোক হতে পেরেছেন পিতা-পুত্র। তাই মোহর আত্মসাতের কথাটা এতদিন বিশ্বাস করেনি এলাকার লোক। প্রবোধবাবু যদি নিজেই ঘড়াভর্তি মোহরের কথা তোলেন, লোকের সন্দেহ তো হবেই।

পিঠে আলতো দুটো টোকা পড়ল, চমকে ঘাড় ফেরায় বিনুকু। দীপকাকু উঠে বসেছেন। চশমা ছাড়া বিনুককে যে চিনতে পেরেছেন এটাই বিরাট ব্যাপার। যা পাওয়ার চশমার! একটু ধরা গলায় বললেন, "বাড়িতে কিছু জানাওনি তো?"

বিনুক মাথা নেড়ে 'না' বোঝায়। দীপকাকু এবার বলেন, "আমার চশমাটা কোথায়?"

কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে গিয়েছে। পেশেন্টের থেকে মনোযোগ সরিয়ে দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, "চশমা আমার কাছে। এর মধ্যেই উঠে পড়লেন! ডোজ কম দিয়েছিলাম ঠিকই। তবে এত তাড়াতাড়ি জেগে যাওয়ার মতো নয়।"

ক্লান্ত হাসি হাসছেন দীপকাকু। চশমাটা টেবিল থেকে তুলেছেন ডাক্তারবাবু। বিনুক ওঁর হাত থেকে নিয়ে দীপকাকুকে দিল। চশমা পরে চেম্বার ঘরটা মাথা ঘুরিয়ে ভাল করে দেখছেন দীপকাকু। আহত হয়ে যখন এখানে ঢুকেছিলেন, ঘরটা দেখার ক্ষমতা ছিল না।

যে পেশেন্টকে দেখছিলেন, তাকে ছেড়ে এগিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু। দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন ফিল করছেন?"

"ভালই। চোটের জায়গাটাতেও ব্যথা বোধ হচ্ছে না। তবে আপনার ওষুধের প্রভাব কমলেই মনে হয় ফিরে আসবে ব্যথাটা।"

"চিকিৎসা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আপনাকে, ওটা আমার দায়িত্ব। ভীষণ খারাপ লাগছে এই ভেবে, আপনাকে ডেকে আনলাম আমি, অথচ সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আই অ্যাম সো সরি। কীভাবে যে আপনার কাছে ক্ষমা...."

ডাক্তারবাবুকে কথা শেষ করতে দিলেন না দীপকাকু বললেন, "আমি একথা আপনার বাবার স্টাডিতে যাব। ওখানে বসেই বাড়ির কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। যাদের সঙ্গে এখনও আমার কোনও কথা হয়নি।"

"ওটা আজ না করলেই নয়? আপনার শরীরের কথা ভেবে বলছি। আমার মনে হয় বাংলোতে গিয়ে এখন আপনার রেস্ট নেওয়াই উচিত," বললেন ডাক্তারবাবু।

দীপকাকু বললেন, "আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। যে কাজগুলো করব বললাম, সেগুলো এখনই করা দরকার।"

বেড থেকে নেমে পড়ে নিজের কাবলি জুতোটা পায়ে গলাচ্ছেন দীপকাকু। ডাক্তারবাবুকে বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে যাবেন স্টাডিতে, না কি অন্য কাউকে দেব?"

ডাক্তারবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই দীপকাকু পা বাড়ালেন চেম্বারের দরজার দিকে। ডাক্তারবাবু বললেন, "ওদিকে নয়। পিছনের দরজা দিয়ে আসুন। বাড়ির লোকজন দরকার মতো এই রাস্তা দিয়েও যাতায়াত করি।"

ডিসপেনসারির পিছনের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বিনুককা। বাগানের মাঝবরাবর এই রাস্তাটা যে খুব একটা ব্যবহার হয় না বোঝই যাচ্ছে। পায়ে চলা পথরেখাটা তেমন স্পষ্ট নয়। মূল বাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "আপনাদের দরোয়ান মেনেগেটে কতক্ষণ মোতায়েন থাকে?"

"শাশু ঠিক দরোয়ান নয়, মালি। বাগানের দেখাশোনা করে। গেট খোলার দরকার পড়লে দৌড়ে এসে খুলে দেয়। এবাড়িতে থাকে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত।"

"ভোর অথবা সন্ধের পরে কেউ যদি আসে বাড়িতে, গেটের তালা

boiRboi.blogspot.com

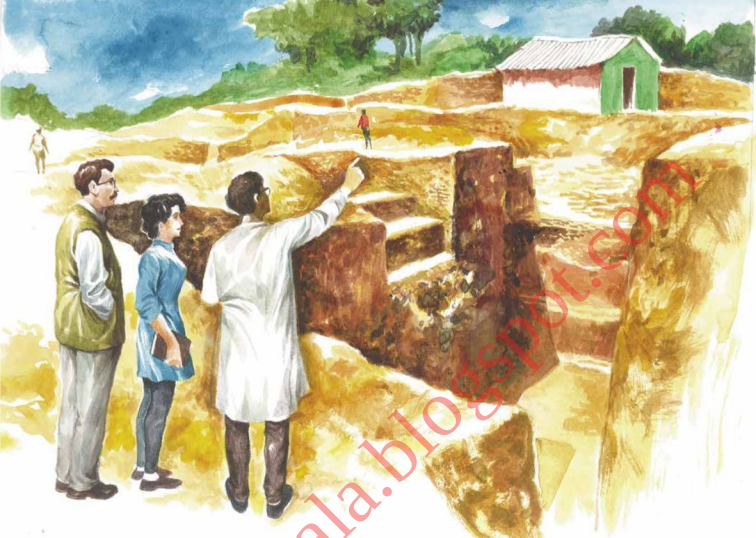

খুলবে কে?"

"গেটের একটা পিলারে ডোরবেল আছে। বাজালেই ভিতর থেকে চাবি নিয়ে আসবে রবি অথবা অনন্ত," বললেন ডাক্তারবাবু।

সদর দরজায় পৌঁছে গিয়েছে ঝিনুকরা। ভেজানো ছিল পাল্লা, ঠেলে ঢুকতে-ঢুকতে ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন, "কার-কার সঙ্গে কথা বলতে চান আপনি?"

"মালি দাশু, আপনার ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে, রবি আর অনন্ত," বললেন দীপকাকু।

দালানে উঠে এসেছে ঝিনুকরা। দীপকাকু যেহেতু স্টাডিতে বসবেন বলেছেন, একতলার ড্রয়িংয়ের দিকে গেলেন না ডাক্তারবাবু। সিঁড়ি লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে-যেতে বলছেন, "বাকিরা তো সব বাড়িতেই আছে, রানাকে নিয়ে চিন্তা।"

"খুব দূরে না গেলে ফোন করে ডেকে নিন।"

ঝিনুক আন্দাজ করতে পারে রানা ডাক্তারবাবুর ভাইয়ের ছেলে। তাকে নিয়ে চিন্তা কেন? বেশি সময় বাড়ির বাইরে থাকে বলে?

প্রবোধবাবুর স্টাডিতে এখন শুধু দীপকাকু আর ঝিনুক। ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন যাদের সঙ্গে কথা বলতে চান দীপকাকু, সকলেই আছে। দীপকাকু বলেছিলেন, "ওদের স্টাডির দরজার কাছে আসতে বলুন। আমি এক-এক করে ডেকে নেব। আপনি চেম্বারে ফিরে যান। পেশেন্টরা অপেক্ষা করছে।"

উত্তরে ডাক্তারবাবু বললেন, "রোগীদের শ্যামল সামলে নিতে পারবে। খুব দরকার পড়লে ডেকে নেবে ফোন করে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে এমন কারও এখানে থাকা দরকার। কখন কী প্রয়োজন পড়ে..."

"তা হলে এক কাজ করুন। বলাইবাবুকে আমার সঙ্গে থাকতে বলে দিন। বাড়িতে ডাক্তার উপস্থিত থাকতেও কম্পাউন্ডার পেশেন্ট দেখবে, এটা ন্যায়সঙ্গত নয়। ডাক্তার আর কম্পাউন্ডারের মধ্যে বিস্তর ফারাক," বলেছিলেন দীপকাকু।

মুখ শুকনো করে ফিরে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। এই ইন্টেরোগেটিং সেশনে দীপকাকু যে ওঁর উপস্থিতি চান না, সেটা বুঝতে পারলেন কি না, কে জানে!

স্টাডির একটা চেয়ার দরজার দিকে মুখ করে নিয়ে বসলেন দীপকাকু। খানিকক্ষণের মধ্যে ঘরে ঢুকেছিলেন বলাইবাবু। বললেন, "বলুন স্যার, কী করতে হবে? যাদের সঙ্গে কথা বলবেন, ডাকব?"

"এক-এক করে। প্রথমে রানাকে পাঠিয়ে দিন," মিনিটখানেক হল বলেছেন দীপকাকু। রানা এখনও ঘরে আসেনি। ঝিনুক খাতা আনতে ভুলেছে। দীপকাকুর আহত হওয়ার খবর শুনে মাথার ঠিক ছিল না। এখন তাই মোবাইলেই নোট করে নেবে।

ঘরে ঢুকল রানা। হাইট বেশ ভাল। দীককাকুকে চেম্বারে যখন দেখতে এসেছিল, তখনই লক্ষ করেছে ঝিনুক। চেহারাতেও স্টেজ শো-এর পালিশ আছে। গানের শো করে। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার পরিচয় তুমি জান?"

"জানি। মানে জেনে গেছি। জেঠু আমায় জানাননি।"

"কেন জানাননি বলে তোমার মনে হয়?"

boiRboi.blogspot.com

"জেঠুকে এই প্রশ্নটা করলে, বলবেন, আমি বাড়ি থাকি না, সংসারের কোনও খোঁজ রাখি না, আমায় বলে কী লাভ! কিন্তু আপনি ভাবুন, শ্যামলকাকা, বলাইমামা এরা তো সরাসরি আমাদের বংশের লোক নয়। তারা আপনার আসার খবর জানে। আমাকে জানানো হল না। এটা তো এক ধরনের অপমান।"

একটু চুপ থেকে দীপকাকু বললেন, "তোমার জেঠু তোমাকে খুব একটা পছন্দ করেন না, এটা বোধ হয়তো। কিন্তু কেন?"

"আমার প্রফেশন। লেখাপড়ার বাড়ির ছেলে হয়ে গানবাজনা করি, স্টেজ শো করি দূর-দূরান্তে গিয়ে। নাইট শো-ও থাকে। হয়তো দু'-তিনদিন বাড়িই ফিরলাম না। এ ছাড়া আর-একটা অভিযোগ। আমি দেদার খরচা করি," থেমে গিয়ে কী যেন ভাবছে রানা। ফের বলে ওঠে, "আসলে কী জানেন, জেঠু চান না আমি আপনার তদন্তের কাছাকাছি থাকি। চারঘড়া মোহরের খোঁজ হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু আপনার তদন্তে দাদুর দামি কিছু আর্কিয়ো-শোউপ সামনে চলে আসতে পারে। যেগুলো সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না জেঠু। এবার সেই জিনিসগুলো যত্ন করে রেখে দেবেন। ওঁর ভয়, আইটেমগুলো থেকে আমি যেন কিছু না সরাতে পারি। সন্দেহের কারণ, আমার খরচার হাত লম্বা।"

"মোহরের ঘড়া পাওয়া যাবে না কেন বলছ? কী বেসিসে?" কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

রানা বলল, "আমার মনে হয় অসুস্থ লোকের কথায় এত গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না। বিশেষ করে যখন মাথার অসুখ।"

"কেউ-কেউ তো গুরুত্ব দিচ্ছে। এতটাই সত্যি মনে করছে, আজ বাগান খুঁড়ছে, কাল সুযোগ পেলে বাড়ির মেঝে খুঁড়বে। আর কত কিছুই করতে পারে। ওদিকে আবার বিষ্ণুবাবু নতুন করে লোকজনকে ওসকাচ্ছেন।"

"মাইতিবাড়ি কোনওদিনই আমাদের পছন্দ করে না। ওদের কথায় কান না দিলেও চলবে। আর বাগান খোঁড়া নিয়ে কেন যে এত টেনশন করছেন জেঠু, সিকিয়োরিটি জোরদার করলেই সমস্যা মিটে যাবে।" বলা শেষ করার পর বড় করে শ্বাস ফেলে অল্প কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, "আপনাকে ডাকার কেন দরকার পড়ল, সেটাই বুঝতে পারছি না।"

রানার প্রশ্ন আর দীপকাকুর একটা অনুমান এক জায়গায় এসে মিলল। দীপকাকু বলেছিলেন, "আইওয়াশ। এলাকাবাসীর চোখে ধুলো দিতে সুশোভন বসু ডেকে পাঠিয়েছেন দীপকাকুকে। প্রবোধবাবু প্রত্রসম্পদ কোথায় রেখেছেন ডাঃ সুশোভন জানেন।"

"তোমার বোনকে ডেকে দাও," বললেন দীপকাকু।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, দীপকাকু বলে ওঠেন, "ও হ্যাঁ, রানা নিশ্চয়ই তোমার ডাকনাম, ফুল নেম কী?"

"বলগুয় বোস," বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

নোটস লেখা যতটুকু বাকি ছিল, দ্রুত ফোনে লিখে নিচ্ছে বিনুকা। ঘরে ঢুকল রানার বোন। বিনুকের অনুমান মিলে গেল, রানার সঙ্গে এই মেয়েটিই চেম্বারে এসেছিল দীপকাকুকে দেখতে। ভারী মিষ্টি চেহারা মেয়েটার, হাসি-হাসি মুখ। হালকা চালে দীপকাকু বললেন, "তোমার সঙ্গে তো আলাপই হয়নি। নাম কী?"

"পুলকি," বলে ফিক করে হেসে নিল মেয়েটা। ফের বলল, "বাড়ির সবাই ওই নামে ডাকে। ভাল নাম পুলকিতা। কোন কলেজ, কী সাবজেক্ট বলব?"

এবার হেসে ফেললেন দীপকাকু। মাথা নেড়ে না বোঝালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কেন তোমাদের বাড়িতে এসেছি, জান?"

"জানি, কাল রাতেই জেঠু আমায় বলেছেন।"

"তোমার কি মনে হয়, এ বাড়িতে চারঘড়া মোহর লুকনো আছে?"

"থাকতেই পারে। দাদুর সঙ্গে তো আমার খুব ভাব ছিল। অসুখের পর অবশ্য আর চিনতে পারেন না। দাদু বলতেন, 'আমার সংগ্রহে যা সব জিনিস আছে না, তোরা ভাবতে পারবি না!' আমি বলতাম, 'কী জিনিস, কোথায় আছে বলো না?' দাদু হাসতেন। বলতেন, 'এখনও সময় হয়নি বলার। একটা ঘটনার অপেক্ষায় আছি। সেটা ঘটে গেলেই সব বলব।' ঘটনা ঘটে গেল নিজের জীবনেই। কথাটা বলার ক্ষমতা রইল না।"

"তা বলে চারঘড়া মোহর। দাদুর কথা শুনে কি মনে হত, এত বিশাল সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন?" বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের গলায় প্রশ্ন রাখলেন দীপকাকু।

পুলকিতা বলল, "দাদুকে বোঝা খুব মুশকিল। এমনিতে হাসিখুশি। নিজের সাবজেক্টে ভীষণ সিরিয়াস। মর্জি হলে ওই সব বিষয়ে দু'-চার কথা বলতেন। যদিও আমি ছাড়া বাড়ির আর কারও শোনার আগ্রহও ছিল না। বলাইমামার সঙ্গে অবশ্য অনেক কথাই বলতেন। মামা একেবারে দাদুর ডান হাত।"

পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে দীপকাকু একটু বিরতি নিলেন। জানলা গলে মেঝেয় পড়া রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন! মাথা তুললেন এবার। বললেন, "একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। লাস্ট তোমরা যখন দিঘায় বেড়াতে গেলে দাদুকে নিয়ে, এবাড়ির কাজের লোক ফোন করে তোমার জেঠুকে জানিয়েছিল বাগান খোঁড়া হয়েছে, তখন তুমি কোথায় ছিলে? জেঠুর আশপাশেই ছিলে কি?"

প্রশ্নটা দীপকাকু কেন করলেন, আন্দাজ করতে পারছে বিনুকা। ফোনটা গটআপ, মানে ভাড়াবাবুর নির্দেশে এসেছিল কিনা, পরিস্থিতি শুনে বোঝার চেষ্টা করছেন।

পুলকিতা বলছে, "ফোন যখন এল, বাড়ির সবাই মিলে হোটেলের লনে ব্রেকফাস্ট সারছি। খবর শুনে জেঠু ভীষণ নার্ভাসমতো হয়ে গিয়েছিলেন। গলা তুলে ডেকেছিলেন শ্যামলকাকাকে। ফোনের কথাটা জানানোর পর বলেছিলেন, 'এখনই ফিরতে হবে বাড়ি। সবাইকে ব্যাগ গোছাতে বলো।' "

"ক্যামিলি ট্রিপে শ্যামলবাবু কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"গাড়ি চালাতে জানে বলে," বলার পর থমকাল পুলকিতা। ফের বলল, "তা হলো শ্যামলকাকু তো আমাদের ফ্যামিলিরই হয়ে গিয়েছে। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা আর রাতে নিজের বাড়ি যায়। সেখানে কাকিমা, দুই বাচ্চা আছে। আর বুড়ো মা-বাবা।"

বুদ্ধি করে নিজেকে শুধরে নিল পুলকিতা। গাড়ি চালাতে পারে বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বলা মানে শ্যামলবাবুকে ছোট করা। দীপকাকু বললেন, "এতজন মিলে একটা গাড়িতে?"

"না-না, আর-একটা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল," বলল পুলকিতা।

দীপকাকু বললেন, "ব্যাঙ্ক ইউ। তুমি এবার রবি বা অনন্ত যে-কোনও একজনকে পাঠিয়ে দাও।"

রবি এবং অনন্তকে চেনে বিনুকা। কাল সকালে যখন এসেছিল এবাড়িতে, এই দু'জন চা-জলখাবার দিয়েছিল। সুশোভনবাবু রবিকে চা দিতে বলেছিলেন নিজের জন্য। অন্যজন তার মানে অনন্ত। কিন্তু না, কাজের লোকের বদলে ঘরে ঢুকে এলেন বলাইবাবু। দীপকাকুকে বললেন, "আপনাদের ব্রেকফাস্ট রেডি করতে বলি?"

"বলুন। তবে কালকের মতো হেভি কিছু নয়। মুড়িচুড়ি হলেই ভাল।"

দীপকাকুর কথায় বিনুক অবাক। সকালবেলায় মুড়ি! বলাইবাবু কিন্তু আশ্চর্য হননি। মুখে হাসি নিয়ে বললেন, "হালকা খাবার বলতে আমার মনে হয়েছিল মুড়িই বলবেন। যতই হোক আমাদের দেশের লোক আপনি। সঙ্গে ঘুগনিও আছে। চলবে তো?"

"চলবে," অন্তরঙ্গতা হাসি সহ বললেন দীপকাকু।

বলাইবাবু ঘর ছেড়ে যেতেই ঢুকল রবি। মাথা নিচু করে দীপকাকুকে নমস্কার জানাল। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন হল কাজ করছ এবাড়িতে?"

"পনেরো বছর তো হলই।"

"এতদিন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে বাগান খোঁড়ার দিন পড়ে-

পড়ে ঘুমোলে!"

মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রবি। একটু বেশিই সময় নিচ্ছে। দীপকাকুর বদলে বিনুক বলে ওঠে, "কী হল! কিছু বলছ না যে!"

চোখ তোলে রবি। ভীরু কণ্ঠে বলে, "ওইদিন যে বাগান খুঁড়বে কী করে জানব! সব দরজায় খিল-ছিটকিনি লাগিয়ে ঘুমোতে গিয়েছি। বাড়িতে আমি আর অনন্ত ছাড়া কেউ ছিল না। ঘুমটা জোর হয়ে গিয়েছিল।"

"কে প্রথম দেখল বাগান খোঁড়া হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

রবি বলল, "বিশুমালি। কাজে এসে প্রথমে বাড়ির বাইরেটা জুড়ে পাক মারে তো, বাগান গিয়ে যেই দেখেছে মাটি খোঁড়া, সদর দরজায় এসে ধাক্কা মেরে, চেঁচামেচি করে আমাদের জাগাল।"

একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "মালির কাছে তার মানে গেটের চাবি একটা থাকে। সকালে ডিউটিতে এসে গেটের ডোরবেল বাজিয়ে তোমাদের ডাকতে হয় না।"

"না, বিশু তো দরোয়ানের কাজটাও করে, যতক্ষণ এবাড়িতে থাকে। বাবু ওকে একটা চাবি দিয়ে রেখেছেন।"

"বিশু লোকটা কেমন? কী ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেশে?"

"এমনি ভাল লোক। বদস্বভ নেই। তবে মালির কাজটা মোটেই তেমন জানে না। দেখছেন না এ বাড়ির চারপাশে এত জমি, গুছিয়ে বাগান করে উঠতে পারেনি। ফল-ফুল বিশেষ হয় না।"

"হুম," বলার পর দীপকাকু রবিকে জানালেন, "এবার তুমি যাও। পাঠিয়ে দাও অনন্তকে।"

ঘাড় কাত করে দরজার দিকে পা বাড়াল রবি। পয়েন্ট লেখার পাশাপাশি বিনুক এটাও নোট করে রাখল, বিশুমালির কাছে মেনগেটের চাবি থাকে। বাগান খোঁড়ার জন্য লোক ঢোকাতে পারে সে। এ বাড়ির পাঁচিলের হাইট ভালই। ডিঙনো কঠিন।

ঘরে ঢোকে অনন্ত। সে-ও রবির মতো নমস্কার জানাল দীপকাকুকে। অনন্তর কাছে দীপকাকুর প্রথম প্রশ্ন, "ডাক্তারবাবুর বাবা যে বলেন এই ঘরে লুকিয়ে কেউ ঢুকেছে, তুমি কি কখনও বাইরের কাউকে ঢুকতে বেরতে দেখেছ?"

"না, আমি বড়বাবুর এই ঘরের দিকে বড় একটা তাকাই না।"

"কেন তাকাও না?"

"ভয়ে।"

"কীসের ভয়?"

"ভূতের।"

"ভূতের!" সবিস্ময়ে কথাটা রিপিট করলেন দীপকাকু। বিনুকও অবাক হয়েছে। দীপকাকু জানতে চাইলেন, এ ঘরে ভূত আসতে যাবে কেন?

"আসবে না! এ ঘরে মানুষের হাড়গোড়, মোহর অনেক কিছুই আছে। সেগুলো যাঁদের, তাঁরা তো ঘুরঘুর করবেনই।"

একুনি হেসে ফেলতে যাচ্ছিল বিনুক, কোনওক্রমে সামলায়। দীপকাকু কিন্তু সিরিয়াস। ফের অনন্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "বড়বাবুর কাছে থাকা মোহর তুমি দেখেছ?"

"না, দেখিনি। শুনি তো আছে। গ্রামের লোক বলে।"

"সেদিন তোমরা এত দেশী করলে যে, বাইরের লোক এসে বাগান খুঁড়ে গেল, টের পেলে না। অথচ তোমাদের উপরই ছিল গোটা বাড়ির দায়িত্ব।"

অনন্তর মুখে অবাক ভাব। বলে, "কে বলল আপনাকে, আমরা সে রাতে নেশা করেছিলাম?"

"রবিই তো বলে গেল, 'বাড়িতে কেউ ছিল না। আমরা নেশা করেছিলাম। জোর ঘুম হয়ে গিয়েছিল। তাই কিছু টের পাইনি।"

দীপকাকু জেরাচ্ছেন করছেন। এটা জেরার একটা কৌশল। অভিযোগ শুনে এতটাই অবাক অনন্ত, ঘোর কাটতে সময় লাগল। বলে ওঠে, "আমার নামে এত বড় অপবাদ দিয়ে গেল রবি। আমি কোনওদিন নেশা করিনি। রবি বরং একসময় করত, সেদিন অবশ্য করেনি।"

দীপকাকু হাসছেন। বললেন, "না-না, রবি কিছু বলেনি। আমি মজা করলাম তোমার সঙ্গে।"

"তাই বলুন!" অল্প হাসিসহ বলে অনন্ত।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা। সেদিন বিশুমালি ডেকে তোলার পরও কি ঘুম কাটছিল না তোমাদের? চুলুনি বা গা মাজমাজে ভাব রয়ে গিয়েছিল?"

"কে বলল আপনাকে, রবি?"

"না, রবি বলেনি। যেটা জিজ্ঞেস করলাম, তার উত্তর দাও।"

"হ্যাঁ, সেদিন ওরকম হচ্ছিল। জলতেষ্টা পাচ্ছিল খুব। বিশুমালির সঙ্গে খোঁড়া জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে রবি ফোন করল বাবুকে। জলটল খেয়ে আবার আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল বাবুরা আসার একটু আগে। ভাগ্যিস ভেঙেছিল।"

"ভাগ্যিস কেন?" বাড়তি কৌতূহলে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

অনন্ত বলল, "বাবুরাও আপনার মতোই সন্দেহ করতেন যে, আমরা কেশা করে ঘুমিয়েছি।"

"আমি এরকমই কিছু একটা আশা করেছিলাম," স্বগতোক্তির ঢঙে কথাটা বলে জানলার দিকে মুখ ঘোরালেন দীপকাকু, দৃষ্টি রইল বাইরে।

বিনুক বুঝতে পারে না। কোন বিষয়টা আশা করেছিলেন? দৃষ্টি ফিরিয়ে দীপকাকু অনন্তকে বললেন, "তুমি যাও। বিশুমালিকে আসতে বলো।"

অনন্ত দরজা পেরোতেই বিশুমালি হাজির। জানে এবার তারই পালা। যেহেতু সে শেষ ব্যক্তি। দীপকাকুকে নমস্কারের ভঙ্গি সারা হল তার। প্রশ্নে গেলেন দীপকাকু, "তুমিই প্রথম দেখেছিলে বাগান খোঁড়া হয়েছে?"

ঘাড় হেলিয়ে সমর্থন জানায় মালি। দীপকাকু এবার জিজ্ঞেস করলেন, "খোঁড়ার জায়গায় নিশ্চয়ই অনেকের পায়ের ছাপ দেখেছিলে? তখন তো কুয়াশা পড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল, ভিজে ছিল মাটি।"

"হ্যাঁ, অনেক পায়ের ছাপ দেখেছি। মচ্ছবের চাতালেও উঠে এসেছিল ওরা।"

বিনুক এখন জানে মচ্ছব বলতে মহোৎসব বোঝাচ্ছে বিশুমালি। অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন। দীপকাকু জানতে চাইলেন, "পায়ের ছাপ দেখে কী মনে হয়েছিল, কতজন এসেছিল বাগান খুঁড়তে? দশজন না দশের বেশি?"

"সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে অনেকের ছিল। ঢের পায়ের ছাপ!"

বিনুক বলে ওঠে, "আমি একটা প্রশ্ন করব?"

পারমিশনটা চাওয়া দীপকাকুর থেকে। উনি বললেন, "করো।"

বিনুক বিশুমালির উদ্দেশে বলে, "এবাড়ির দেওয়াল বেশ উঁচু, বাগানের দিকে আরও। তোমার কী মনে হয় ওরা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল, নাকি গেট দিয়ে?"

বিনুক আসলে বুঝতে চাইছে দুষ্কৃতীদের গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল কিনা, সেটা রবি, অনন্ত, বিশুমালিই পারে।

উত্তরে বিশুমালি বলল, "গেট দিয়ে কী করে ঢুকবে! চাবি ছিল একটা আমার কাছে, আর-একটা রবি, অনন্তের জিম্মায়।"

কথা শুনে বিনুক বুঝে উঠতে পারল না, লোকটা সরল, নাকি সারল্যের ভান করছে? বিনুকের প্রশ্নটা মাঠে মারা যাচ্ছে দেখেই বোধ হয় দীপকাকু বিশুমালিকে বললেন, "দ্যাখো, তোমাদের গেট না খুলেও ভিতরে ঢোকা যায়। গ্রিলের গেট, নীচের ফিটতিনেক টিনের পাতে ঢাকা। গ্রিলে পা রাখার জায়গা আছে, পাঁচিলে নেই," থামলেন দীপকাকু। ফের বলে ওঠেন, "ওরা যদি গেট বেয়ে ঢুকে এবং বেরিয়ে থাকে, বেরনোর সময় পায়ের মাটির গ্রিলে লেগে থাকবে। তেমন কি

boipathshala.blogspot.com

তুমি কিছু দেখেছ?"

"আজ্ঞে না, দেখার কথা মাথায় আসেনি," কাঁচমাচু মুখে বলল বিশুমামিল। যেন না দেখাটা অপরাধ হয়ে গিয়েছে।

"ঠিক আছে। এবার তুমি আসতে পার," বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। স্টাডির আলমারির দিকে ঘুরে এগোতে থাকেন। ফোনে নোট লেখা শেষ করতে থাকে ঝিনুক। বলাইবাবু ঢুকে এলেন ঘরে। বললেন, "জলখাবার রেডি। এখানে দিতে বলব, নাকি ডাইনিংয়ে যাবেন?"

ঘুরে দাঁড়ালেন দীপকাকু। বলাইবাবুকে বললেন, "ডাইনিংয়ে এই খাব। খাওয়ার পর ছাদে যাব একবার। তারপর ফের এখানে আসতে হবে।"

"কোনও আসুবিধে নেই। যেমন ইচ্ছে আপনার। আগে তো খেয়ে নিন। নিশ্চয়ই এতক্ষণে খিদে পেয়ে গিয়েছে খুব!" বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন বলাইবাবু।

ঝিনুকরা এখন ছাদে। কাছেপিঠে একটাও দোতলা বাড়ি নেই, তাই গ্রামের চারপাশ বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। প্রচুর গাছপালা। দোতলা এই বাড়ি কিন্তু শহরের তিনতলা বাড়ির সমান। একেই তো উঁচু ভিতের উপর বাড়ি, ঘরের দেওয়ালগুলোও শহরের সাধারণ বাড়ির তুলনায় লম্বা। দীপকাকু ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছেন, সঙ্গে ঝিনুক আর বলাইবাবু। ডাইনিংয়ে বসে তৃপ্তি করে জলখাবার সারলেন দীপকাকু। ঝিনুকেরও খেতে ভাল লেগেছে। দেশের বাড়ির ঢেকফাস্ট মাকে বলতে হবে এই আইটেমগুলো করতে। জলখাবার যদিও লাইট ছিল না। মুড়ি, ঘোঁয়া ওঠা গরম ঘুগনির সঙ্গে কলা, দু'রকমের মিষ্টি। দীপকাকু অতটা মুড়ি কী করে চিবোবেন, তা নিয়ে চিন্তায় ছিল ঝিনুক। সদ্য মাথায় আঘাত লেগেছে, চিবোতে গেলে ব্যথা করবে মুখমণ্ডলের পেশিতে। কিন্তু না। দেখা গেল মুড়ি, গরম ঘুগনি কয়েক চামচ খেয়ে নেওয়ার পর, মুড়ির বাটিতে ঘুগনি ঢেলে তার উপর জল মিশিয়ে দিব্যি খেয়ে নিলেন।

তা দেখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আর্দ্র মা-কাকিমা মুখে ঘুষ্টি চাপা দিয়ে হাসছিলেন। বলাবলি করছিলেন, দীপকাকু দেশের বাড়ির খাবার খাওয়ার ধরনটাও ভোলেননি! খেতে-খেতেই দেশের বাড়ির রান্নাবান্না নিয়ে মা-কাকিমার সঙ্গে খানিক আলোচনা সেরে নিলেন দীপকাকু। তখন মনে হচ্ছিল মাথার ব্যাঙেজটা বুঝি ফলস, কে বলবে সকালেই আঘাত পেয়েছেন শরীরে, আজ সন্ধ্যাবেলাও লেগেছে যুদ্ধে।

নীচে চা খেয়ে ছাদে এসে সিগারেট ধরিয়েছিলেন দীপকাকু। সিগারেট এখন শেষ। পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নীচটা দেখছেন। ছাদটা বোধ হয় বারতিনেক পাক খাওয়া হয়ে গেল মাঝে কয়েকবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলাইবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার নীচে দুটো তলার ঘরে কে-কে থাকে?"

বলাইবাবু উত্তর দিয়েছেন। এবার দীপকাকু পায়ে-পায়ে পাঁচিলের এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালেন, যার পাশে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গিয়েছে বাগানে। কলকাতার পুরনো বাড়িগুলোতে এরকম সিঁড়ি দেখা যায়। পাঁচিলের বাইরে মাথা নামিয়ে দীপকাকু বলাইবাবুর উদ্দেশে বললেন, "এই সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি ছাদে উঠে আসা যায়। যদি চোরটোর উঠে আসে..."

"এই সিঁড়ি এবাড়ির কর্তার বাবার তৈরি। বসার ঘরের অতিথিকে অন্দরমহলে হয়ে ছাদে নিয়ে আসার চাইতে বাগান থেকেই ছাদে আনাটা উচিত মনে করতেন। পুরনোদিনের মানুষ তো, ভিতর বাড়ির গোপনীয়তা প্রকাশ্যে আনতে পছন্দ করতেন না।"

"কিন্তু এখনকার দিনে এই ধরনের সিঁড়ি মানে অন্দরমহলে ঢোকার পথ। এটা তো খুলে সরিয়ে দিতেই পারেন ডাক্তারবাবু।"

"দেওয়াই যায়। তবে এই রাস্তা দিয়ে বাড়ির ভিতরে কেউ ঢুকতে পারবে না। সে পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনিতে ছাদের দরজার পিছনে একটা গ্রিলের গেট আছে, ঢোকার সময় দেখেছেন। সব সময় চাবি মারা থাকে। তার চেয়েও বড় কথা ঘোরানো সিঁড়ির একদম নীচটা দেখুন, কাঁটাতার দিয়ে প্যাঁচানো রয়েছে। প্রথম দশ-ধাপে পা রাখা যাবে না," সিঁড়ির নীচে আঙুল নির্দেশ করে বললেন বলাইবাবু।

"ব্যবস্থাটা আমি দেখেছি। তবে এসব আপদ বিদেয় করে দেওয়াই ভাল। বিশেষ করে যখন এ বাড়িতে প্রত্নতত্ত্বের মূল্যবান নথি, নানান আইটেম আছে," মতামত দিলেন দীপকাকু।

বলাইবাবু বললেন, "আসলে কী জানেন, বাবার তৈরি জিনিস তো, বড়কর্তার মন সায় দেয় না সরিয়ে দিতে। তা ছাড়া এই ধরনের সিঁড়ি বাড়ির সাবেকিয়ানাও প্রমাণ করে, তাই হয়তো রেখে দিয়েছেন।"

দীপকাকু এগিয়ে গেলেন পাঁচিলের সেই জায়গায়, যেখানে দাঁড়িয়ে বাগানের কোণানো অংশটা দেখা যায়। ওই দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, "এবার তা হলে স্টাডিতে যাওয়া যাক। আলমারির চাবিগুলো নিয়ে আসুন ডাক্তারবাবুর থেকে।"

প্রবোধবাবুর টেবিলটাই এখন যেন মোগলমারি টিবির ছোট সংস্করণ। স্টাডির আলমারিগুলো থেকে প্রচুর বইপত্র টেবিলে নামিয়েছেন দীপকাকু। টেবিলসংলগ্ন চেয়ারে বসে খুব মন দিয়ে সেগুলোর পাতা উলটে পড়ে যাচ্ছেন। নোট নিচ্ছেন দরকারমতো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার। নিজের শার্টের পকেটে পেন আছে ভুলে গিয়ে উনি প্রবোধবাবুর পেন ইউজ করছেন, তাও কালির পেন। নিজে বলপেনে লেখেন।

গোয়েন্দাগিরির এই পাটটা ঝিনুকের বড় অপছন্দের। খুঁটিয়ে এত নথিপত্র দেখা ভীষণ বোরিং। এ যেন খড়ের গাদায় সূচ খোঁজা। এমন হতেই পারে এর খুঁজেও কোনও ক্লু পাওয়া গেল না। আলমারি থেকে ফাইলপত্র-বই নামাতে সাহায্য করে ঝিনুক চলে এসেছে স্টাডির একমাত্র জানলার সামনে। বাইরেটা কী সুন্দর খোলামেলা! বাড়িটাকে রিসর্ট মনে হচ্ছে যেন! তবে বিশুমামিল অবশ্যই বাগানটার যত্ন নেওয়া উচিত। সে বোধ হয় দরোয়ানের কাজটাই বেশি পছন্দ করে... ভাবনা থেমে গেল ঝিনুকের, মেনগেটে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো মোটরবাইক, তাতে চারজন যুবক আরোহী। বিশুমামিল তড়িঘড়ি পায়ে গেটের কাছে যায়। গ্রিলগেটে ফাঁক দিকে ইয়াং ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলে। ওরা বোধ হয় বিশুমামিলকে গেটের বাইরে আসতে বলছে। ঠিক তাই, বিশুমামিল পকেট থেকে চাবি বের করে গেটের তালা খুলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘটনাটা দীপকাকুকে বলতে যাবে ঝিনুক, চোখ থমকায় ঘরের দরজায়, বৃদ্ধ প্রবোধবাবু টলমল পায়ে ঢুকে আসছেন ভিতরে, জড়ানো গম্ভীর গলায় বলছেন, "কে, কে ওখানে?"

ঘাবড়াতেও ভুলে গেল ঝিনুক, চোখের সামনে দেখল নিজের হাটটা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

॥ ৪ ॥

আজ দীপকাকুর আগে ঘুম ভেঙেছে ঝিনুকের। বিছানায় শুয়ে মোবাইলে টাইম দেখেছিল। ছ'টা পাঁচ। এত সকালে না উঠলেও চলত। দীপকাকু বলেছিলেন আটটার আগে রেডি থাকতে। থানা থেকে জিপ আসবে, যাওয়া হবে বিষ্ণু মাইতির বাড়ি। এই কেসে বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে কথা বলাটা নাকি ভীষণ জরুরি। সুশোভনবাবুর পরিচিত স্বপন মিশ্রর ফোন যেভাবে অগ্রাহ্য করেছেন বিষ্ণুবাবুর ছেলে সলিল, বাবার সঙ্গে দীপকাকুকে দেখা করতে দেননি, এর পর পুলিশের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

ঝিনুকরা দু'জন এখন থানার জিপে। সঙ্গে দু'জন পুলিশ। একজন ড্রাইভার, অন্যজন কনস্টেবল। সুশোভনবাবু জানেন না ঝিনুকরা যাচ্ছে ওঁর এলাকা, মানে মোগলমারিতে। জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি দীপকাকু। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করাটা উনি পছন্দ করেন। সেই জন্যই প্রথমবার বাংলোয় পা দেওয়ার পর একবার লোকাল থানায় গিয়েছিলেন আলাপ সারতে। সেই যোগাযোগটা এখন কাজে লাগছে। সম্ভবত থানায় ফোন করে আজকের প্ল্যান তৈরি

boiRboi.blogspot.com

করেছেন দীপকাকু। কাল কখন ফোন করলেন, কে জানে! ডাক্তারবাবুর বাবা প্রবোধবাবু স্টাডিতে ঢুকে পড়ার পর থেকেই ভীষণ রকম গম্ভীর ছিলেন দীপকাকু। যদিও প্রবোধবাবু স্টাডিতে ঢুকে 'কে, কে ওখানে' বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হন বিনুকাকু। প্রবোধবাবুকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ফেরত নিয়ে যান। ওঁকে বলেন, "উনি কলকাতা থেকে এসেছেন। সুশোভনদার চেনা। আপনার কাজগুলো সুশোভনদাই ওঁকে দেখতে বলেছেন।"

প্রবোধবাবু কত দূর কী বুঝেছিলেন, ধরা গেল না। ঘর ছেড়ে যেতে অন্তত আপত্তি জানাননি। একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন বলাইবাবু। খুবই কুণ্ঠার সঙ্গে দীপকাকুকে বলেছিলেন, "আপনি কিছু মনে করেননি তো? বড়কর্তা যে দুর করে এখানে চলে আসবেন, বুঝতে পারিনি আমরা। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল এ ঘরে আসার কোনও ইচ্ছে দেখিনি ওঁর মধ্যে। মনে হয়েছিল ঘরটাই বুঝি ভুলে গিয়েছেন। আজ যে হঠাৎ কী হল!"

কথাগুলো শুনতে-শুনতে দীপকাকু কিছু একটা ভাবছিলেন। বলাইবাবু বলা শেষ করতেই। খেয়াল ভঙ্গি ফেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো প্রবোধবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন, ওঁর ভুলে যাওয়া রোগটার কবে থেকে, কীভাবে শুরু হল নিশ্চয়ই বলতে পারবেন?"

"পারব। মাসতিনেক হল বোধ হয়। দেখতাম বড়কর্তা ইতিহাসের ছেটখাট তথ্য ভুলে যাচ্ছেন। যেমন আমায় জিজ্ঞেস করলেন। 'ইং-সিন কত ছিস্টাদে' যেন তাম্রলিপ্তয় আসে?' বা 'গুজর খাঁ কোন যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তুর্কোরায়ের না হলদিঘাটের?' এ সব আগে জলের মতো মুখস্থ ছিল বড়কর্তার। আমিই বরং নোট করে রাখতাম। সুশোভনদাকে বললাম, 'বড়কর্তা কিন্তু বড্ড ভুলে যাচ্ছেন।' গা করেননি সুশোভনদা। বলেছিলেন, 'বয়সকালে এরকম একটু হবেই।' তার কিছুদিন পর বড়কর্তা বললেন, 'কলকাতায় যাব। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।' সত্যিই অনেকদিন যাননি। আগে হাবেশাই যেতেন হিষ্ট্রির প্রোফেসরদের সঙ্গে আলোচনা করতে, যেতেন স্টেট আর্কাইয়োলজিকাল অফিসে। ভাবলাম, কলকাতায় আলোচনা করতে যাওয়ার মনের জোর যখন আছে, মনের ভুলটা তেমন সিরিয়াস কিছু না," টানা কথা বলে থেমেছিলেন বলাইবাবু।

দীপকাকুর জানা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "শেষমেশ উনি গিয়েছিলেন কলকাতায়?"

"গিয়েছিলেন।"

"বাই রোড গিয়েছিলেন, না ট্রেনে? কতদিন ছিলেন?"

"দিনের দিনই ফিরে এসেছিলেন। কলকাতা গেলে বাড়ির গাড়িতেই যান। ট্রেনের টাইম বড়ে চলতে হয় না। কলকাতা এখান থেকে খুব দূরও তো নয়। আমি যবে থেকে ওঁর সঙ্গে আছি, কলকাতায় রাত কাটিয়েছেন মাত্র দু'বার, প্রোফেসার বন্ধুর বাড়িতে," বলেছিলেন বলাইবাবু।

দীপকাকু তখন জানতে চান, "কলকাতা থেকে ফেরার পর ওঁর ভুলে যাওয়া রোগটা একইরকম রইল?"

ঘাড় নেড়ে বলাইবাবু বলেছিলেন, "না, ক্রমশ বাড়তে থাকল। কাউকে ডাকতে গিয়ে নাম ভুলে যেতেন। আমাকে মনে করিয়ে দিতে বলতেন নামটা। কখনও ভুল নামে ডাকতেন অত্যন্ত চেনা কাউকে। খেতে বসে ভাতে ডাল ঢালার বদলে গ্লাসের জল ঢেলে ফেলতেন। তখন সুশোভনদা বুঝলেন বড়কর্তার স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে। চিকিৎসা শুরু করলেন। কলকাতার বন্ধু ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করলেন ফোনে। কিন্তু রোগ সারার কোনও নামই নেই। সুশোভনদা বললেন এ রোগ সারে না। বাড়বাড়ন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায় মাত্র। আমার কেন জানি মনে হয় আরও নামী কোনও ডাক্তার দেখানো উচিত। নয়তো মোগলমারির অনেকটা ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা থেকে যাবে। যা একমাত্র বড়কর্তাই আবিষ্কার করেছিলেন। তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সেগুলো প্রমাণ করার মাঝপথে ওঁর মাথাটা গুলিয়ে গেল।"

এর পরই দীপকাকু বলেছিলেন, "আজকের মতো আমার কাজ শেষ। আরও কয়েকঘন্টা বইপত্র দেখলে হত, চোট-লাগা মাথা, প্রেশার পড়ছে। এবার একটু খোলা জায়গায় যাওয়া দরকার।"

"আপনার তো মাথার বাইরে-ভিতরে দু'দিক থেকেই প্রেশার। এতক্ষণ কী করে কাজ করলেন, সেটাই ভাবছি!" বলে আলমারিতে বইপত্র তুলতে গিয়েছিলেন বলাইবাবু।

দীপকাকু বলেছিলেন, "দিন, এগুলো আমি তুলে দিচ্ছি। কোথা নামিয়েছি আমি জানি। কাল আবার দেখতে হবে, তখন নতুন করে খুঁজতে হবে না। আপনি শুধু আলমারির তালাগুলো চাবি বন্ধ করে দিন।"

বসুবাড়ি থেকে যখন বেরনোর উদ্যোগ নিলেন দীপকাকু, আর্যর মা-কাকিমা লাঞ্চ করে যেতে অনুরোধ করলেন। দীপকাকু বলেছিলেন এখনই খিদে পায়নি। আগে বাংলোয় গিয়ে রেস্ট নিতে চান। তারপর যদি খিদে পায় খাবেন। আর্যর মা ঝিনুককে বলেছিলেন, "তুমি অন্তত দু'টি খেয়ে যাও।"

সৌজন্যের হাসিসহ ঝিনুক বলেছিল, "আমারও এখন খিদে পায়নি।"

দীপকাকু বেরচ্ছেন শুনে ডাক্তারবাবুও চেম্বার ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ঝিনুকদের লাঞ্চ না করার কারণটা শুনলেন। নতুন করে আর অনুরোধ করেননি। বলেছিলেন, "ঠিক আছে, শ্যামল আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে বাংলোয়।"

গাড়ি করে ফেরার সময় যাট নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে দাঁতন শহরে ঢোকার মুখে শ্যামল বারিক একটা ধাবা দেখিয়ে বলেছিল, "পারলে এখানে একদিন খাবেন। দারুণ খাবার!"

বাংলোয় এসে দীপকাকু কার্তিক জানাকে বলেছিলেন, "এখন আর রান্না বসাতে হবে না। হাইরোডের মুখে একটা ধাবা দেখলাম, ওখান থেকেই আমাদের জন্য খাবার এনে দাও। তোমার জন্যও এনো। মাছ-ভাত হলেই ভাল হয়।"

অবাক হয়েছিল ঝিনুক, ও বাড়িতে দীপকাকু বললেন খিদে নেই। এখানেই এসেই লাঞ্চ অর্ডার দিলেন। সত্যিই হয়তো কাজের পরিবেশে থাকতে আর ভাল লাগছিল না দীপকাকুর, মাথা জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। খোলা হাওয়ায় আসতে চাইছিলেন।

স্নান সেরে নিয়েছিল ঝিনুক। দীপকাকুও স্নান করেছিলেন, মাথায় জল ঢালেননি। শুকনো ছিল ব্যান্ডেজ। কার্তিক জানা খাবার নিয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছিল। বসুবাড়ির মতোই অনেক পদ, খাবার স্টেডও দারুণ! ধাবার খাবার নিয়ে দীপকাকু কোনও কমেন্ট করছিলেন না। অন্যমনস্কভাবে খেয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় ঝিনুক একটি জরুরি তথ্য জানায় দীপকাকুকে, দুটো বাইকে চারজন ইয়াং ছেলে বসুবাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। বিশুমামি গেট খুলে বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে। ছেলেগুলো কারা, জানতে হবে বিশুমামির থেকে।

একথাতেও দীপকাকু কোনও মন্তব্য করেননি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ছিলেন। ফের ডুবে গিয়েছিলেন ভাবনায়।

খাওয়াদাওয়ার পর দীপকাকু রেস্ট নিতে চলে গেলেন। বিশ্রাম আদৌ নিতে পেরেছেন কিনা, সন্দেহ আছে। কেসটার কিছু-কিছু বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ধন্দে আছেন। নয়তো কথা বলা এভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ঝিনুকও নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছিল। অত ভোরে ওঠা সত্ত্বেও ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল আর ভাবছিল এই ভদ্রতের ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছেন দীপকাকু? ঝিনুক তো এই কেসের নাগালেই পাচ্ছে না। ঘুম আসছিল না দেখে ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে হালকা চ্যাট করে কাটাল ঝিনুক। কেসের কাজে কোথায় এসেছে জানাল বন্ধুরা ফোটো পাঠাতে বলেল। কেসের বিষয় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। বলতে হল বাবার সঙ্গে। সন্ধের দিকে ফোন করেছিলেন বাবা। সকাল থেকে যা-যা হয়েছিল, বলেছে

boiRboi.blogspot.com

ঝিনুক। দীপকাকুর মার খাওয়ার ঘটনাটা শুনে বাবা ভীষণই আতঙ্কিত হলেন। বলেছিলেন, "দীপঙ্কর সঙ্গে পিস্তলটা রাখছে তো? না রাখলে, রাখতে বলিস। মনে হচ্ছে এই তদন্তটা করতে গিয়ে ও হয়তো না জেনেই ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরে ফেলেছে।"

ঝিনুক বাবাকে সতর্ক করেছিল এই বলে, "দীপকাকুর উদ্ভেজ হওয়ার ঘটনাটা আবার মাকে বোলো না। টেনশন করবে মা।"

"মাথা খারাপ তোর! ওকে এসব কেউ বলে! শুনলে এক্ষুনি তোকে আনিয়ে নেবে। তুই বরং দীপঙ্করের পাশে-পাশে থাকিস। আজকের মতো একা হতে দিস না। কাল এই সময়ই আবার ফোন করব। রাখছি," বলে ফোন ছেড়েছিলেন বাবা। দীপকাকুর ঘর থেকে তখন টিভির নিউজ চ্যানেলের আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্থাৎ নিজেকে অনেকটই স্বাভাবিক করে আনতে পেরেছিলেন। রাতে খেতে বসে জানালেন আজকের প্রোগ্রামটার কথা। প্রশংসা করলেন কার্তিক জানার রান্নার। বাবার পরামর্শটা দীপকাকুকে জানায়নি ঝিনুক। কেননা তার স্থির বিশ্বাস কাজের সময় দীপকাকুর কাছে পিস্তল থাকে। আরও অনেক কিছুই বোঝাই করা থাকে তাঁর শার্ট-প্যান্টের পকেটে। এটা অনেকবার ওঁকে অ্যাসিস্ট করার অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছে ঝিনুক।

ডিনার সেরে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছিলেন দীপকাকু। চোখ ছিল কালো আকাশের দিক। অন্ধকারে হয়তো সমাধানের আলো খুঁজছিলেন এই তদন্তের। ঝিনুক তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল, সকাল-সকাল উঠতে হবে যে।

বড্ড তাড়াতাড়ি ভেঙে গিয়েছিল ঘুম। পাশ ফিরে শুতেই পারত ঝিনুক, যদি কালকের মতো হত অবস্থা! কম্বল থেকে বেরতে ইচ্ছে না করলেও, বেরিয়ে এসে টি-শার্টের উপর ফুলস্লিভ কুর্তা চাপিয়েছিল। নভেম্বরেই এখানে বেশ শীত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝিনুক দেখেছিল বাংলোর গেট অল্প খোলা। কার্তিক জানা হয়তো কিছু আনতে বেরিয়েছে। গেট ঠেলে বাইরের লাল মোরামের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল ঝিনুক। দু'-চারটে খড়ের চালা মাটির ঘর। গাছ-পালা, ঝোপ-জঙ্গল পেরোলেই রাস্তার দু'ধারে ধানজমি। ফসলে ভরে আছে মাঠ। ধান গাছে কুয়াশার জল। ধপধপে সাদা বক জমির সামানা উপর দিয়ে বিশাল ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। মোবাইলে বেশ কিছু ফোটো তুলল ঝিনুক। এখান থেকেই বন্ধুদের পাঠাবে। বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে দেখেছিল বড়-বড় লরি কুয়াশা ভেজা শরীর নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সারারাত ধরেই দীর্ঘ যাত্রাপথ পার করেছ এরা।

বাংলোয় ফেরার মুখে ফোন বেজে উঠেছিল ঝিনুকের। দীপকাকুর কল। বকুনির গলায় জানতে চাইলেন, কোথায় ঘুরছে?

ঝিনুক বলেছিল, "এই তো, গেটের কাছেই আছি।"

গলা তুলে দীপকাকু বলতে শুরু করলেন, "তোমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! দেখলে কাল আমাকে একা পেয়ে ওরা কী অবস্থা করল! তারপরও তুমি কাউকে সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়ে পড়লে!"

ঝিনুক ঝট করে একবার পিছন ফিরেছিল, কেউ নেই। কিন্তু বিপদ যে মোগলমারি থেকে এত দূর ধাওয়া করতে পারে, এই আশঙ্কাটা ছিল দীপকাকুর।

মোগলমারি গ্রামে ঢুকে পড়ল জিপ। ঢিবির কাছে এসে ড্রাইভার পুলিশ গাড়ি থামালেন। জানলা দিয়ে এক গ্রামবাসীর কাছে জানতে চাইলেন, "বিষ্ণু মাইতির বাড়িটা কোথায়?"

লোকটি হাত তুলে রাস্তা বলে দেওয়ার পরও, রাস্তা দেখানোর জন্য জিপের দিকে পিঠ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল সামনে। বোঝাই যাচ্ছে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

বিষ্ণু মাইতির বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছল পুলিশের জিপ। পাকা একতলা বাড়ি, তবে বেশ পুরনো। ঝিনুকরা দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে ভিতরে। দৌড়ে এলেন পঞ্চাশের একটু কম-বেশি বয়সের একটি লোক। চেহারাটা ভিলেন টাইপের হলেও, বাড়িতে পুলিশ দেখে মুখচোখ সাদা। অতি বিনয়ে কুঁজো হয়ে কনস্টেবলেকে হাতজোড় করে বললেন, "বলুন স্যার। আপনাদের জন্য কী করতে পারি?"

"আপনার পরিচয়?" জানতে চাইলেন কনস্টেবল।

"আমি সলিল মাইতি। বিষ্ণু মাইতির বড় ছেলে। ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করি।"

কনস্টেবল দীপকাকুকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আমাদের নিজের লোক, আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

হাতেনাতে ফল মিলল। বিষ্ণু মাইতির ছেলে কোনও বেগড়বাই না করে বললেন, "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই কথা বলবেন।"

ঝিনুক, দীপকাকু এখন বিষ্ণুবাবুর ঘরে। ছোট প্রায়ান্ধকার ঘর। বিষ্ণুবাবু বিছানায়, ভগ্ন শরীর, গালে সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। এই ঘরে বাড়ির আর কাউকে থাকতে দেননি দীপকাকু। ইতিমধ্যে কনস্টেবলকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানায় ফিরে যেতে বলেছেন। যাওয়ার সময় কনস্টেবল বললেন, "কোনও অসুবিধে হলে জাস্ট একটা ফোন করবেন, পৌঁছে যাব।"

বিষ্ণুবাবুর বিছানার সামনে রাখা চেয়ারে বসে প্রাথমিক আলাপ পর্ব সেরে নিয়েছেন দীপকাকু। এখন বললেন, "আপনি কী করে এত নিশ্চিত হলেন, প্রবোধবাবু হাতে মেঙ্গলো তুলেছেন, সব সোনার মুদ্রা? তখন তো প্রায় সন্ধে নেমে গিয়েছিল। অন্য কিছুও তুলে থাকতে পারেন আপনার বন্ধু। দেখার ভুল হতেই পারে আপনার।"

ঘড়ঘড়ে গলায় বিষ্ণুবাবু বলতে থাকলেন, "তখনও আকাশে আলো পুরোপুরি নেভেনি। আমরা সনাতনকে টর্চ আনতে বলেছিলাম ওর ঘর থেকে। আমার আর প্রবোধের মাঝে ফিটদশেকের দূরত্ব ছিল। দু'জনেই ভিত খোঁড়া জায়গায় খুঁজছিলাম প্রত্নবস্তু। প্রবোধ অনেকক্ষণের জন্য চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, ওর দিক থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছিলাম না। কিছু পেল কিনা দেখতে ঘাড় ফিরিয়েছি, দেখি ওর হাতে চকচক করছে সোনার মোহর।"

"মোহরে তো মাটি লেগে থাকার কথা, চকচক করবে কেন?"

পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় ঝিনুক, দীপকাকু একটানে মোক্ষম প্রশ্ন করেছেন! এটা তার মাথায় আসেনি। বিষ্ণুবাবুকে কিন্তু এতটুকু বিচলিত দেখাল না। বললেন, "এটা নিয়ে আমারও খানিক ধন্দ ছিল, মুদ্রাগুলো অত চকচক করতে দেখলাম কেন? তা হলে কি চোখের ভুল? জীবনে ওই একবারই চোখের অমন ভুল হতে যাবে কেন? সব উত্তর পাওয়া গেল প্রবোধের মাথাখারাপ হওয়ার পরই। নিজের মুখে বলছে চারঘড়া মোহর। ঘড়ার মধ্যে ছিল বলেই চকচক করছিল মোহরগুলো।"

"তখনই না হলেও ঘড়াগুলো আপনার বন্ধু ওখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন, গ্রামের কেউই দেখতে পেল না। তা কি হতে পারে! তা ছাড়া আপনারা চলে যাওয়া পর সনাতন বেরা নিজে ওই জায়গায় আরও খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। কিছু পাওয়া গিয়েছে বলে শোনা যায়নি," বললেন দীপকাকু।

বিষ্ণুবাবু বলেন, "সনাতন বেরা অনাড়ি। ওরা উৎখননের কী বোঝে? হয়তো ঘড়াগুলোর আশপাশ দিয়ে খুঁড়তে-খুঁড়তে চলে গিয়েছে। প্রবোধের পাকামাথা, ভীষণ বুদ্ধি। ঠিক সময় সুযোগ করে তুলে নিয়ে গিয়েছে ঘড়াগুলো।"

"আচ্ছা, ঘড়াগুলো ওখানে থাকার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য সূত্র কি আপনি দিতে পারবেন? সনাতন বেরার ভিটে কিন্তু মহাবিহারের ফেনসিং-এর ভিতরে নয়, বাইরে কেন ওই যুগের জিনিস থাকতে যাবে?"

"বেড়াটা তো আন্দামনতো দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এর মধ্যেই বিহারের কাঠামোটা ছিল। তার বইরে অনেক স্তূপ, হিন্দু মন্দির পাওয়া গিয়েছে। যাবেও, যদি আরও উৎখনন চালায় সরকার।"

"চারঘড়া মোহর ওখানে এল কীভাবে আন্দাজ করতে পারেন?"

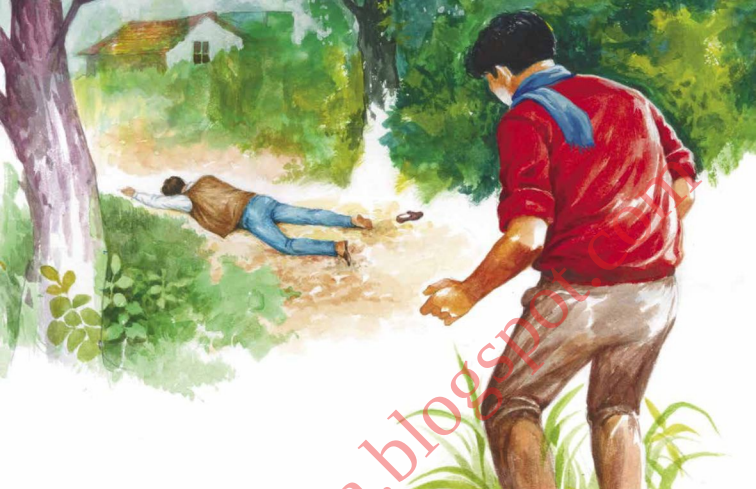

"না করার কী আছে, এ তো সহজ ব্যাপার। নৌকো করে যে বণিকরা ব্যবসা করতে যেত দক্ষিণে, তারা ব্যবসা সেরে লাভের একটা অংশ গচ্ছিত রাখত এই বিহারের সন্ন্যাসীদের কাছে। ওই সম্পদ আত্মসাতের কোনও ভয় নেই। সন্ন্যাসীরা ভীষণ সৎ এবং বিশ্বস্ত। আবার যখন এই পথ ধরে বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত, এখান থেকে নিয়ে যেত তাদের রেখে যাওয়া মুদ্রা। দূর-দূর থেকে আসত তো ব্যবসা করতে। লুণ্ঠনের ভয়ে যাত্রাপথে অত মুদ্রা সঙ্গে রাখত না।"

"তা হলে তো মুদ্রাগুলো বিহারের মধ্যে থাকার কথা, বাইরে রাখা হয়েছিল কেন?"

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুবাবু বলতে থাকলেন, "আমাদের মোগলমারি অনেক যুদ্ধের সাক্ষী। মোগল-আফগান যুদ্ধ এখানেই হয়েছিল। যখনই কোনও যুদ্ধ বা শত্রু আক্রমণের খবর আসত, সন্ন্যাসীরা বিহারের মূল্যবান সামগ্রী অন্য এমন কোথাও লুকোতেন, যাতে লুণ্ঠনকারীদের চোখে না পড়ে। লুকনোর জন্যই হয়তো চারদড়া মোহর বিহারের বাইরে রাখা হয়েছিল।"

কথার মাঝেই দীপকাকুর চোখ চলে গিয়েছে বিষ্ণুবাবুর পিছনে ওয়ালর‍্যাকে। সেখানে কিছু ওষুধের শিশি-প্যাকেট। দীপকাকু চেয়ার থেকে উঠে বিষ্ণুবাবুর মাথার উপর দিয়ে হাত বাড়ালেন র‍্যাকে। তুলে নিলেন একের পর-এক ট্যাবলেট রাখার প্যাকেট, ওষুধের বোতল। উলটেপালটে কী যেন দেখলেন! হঠাৎ ওষুধ দেখার দরকার পড়ল কেন, বুঝতে পারে না ঝিনুক। প্যাকেট, বোতল যথাস্থানে রেখে দীপকাকু পকেট থেকে ফোনসেট বের করলেন। সুইচ টিপে কাউকে কল করলেন। কানে ফোন তুলে বললেন, "বিষ্ণু মাইতির বাড়িতে আছি। গাড়ি পাঠান। স্টাডিতে কিছু কাজ আছে। জলখাবার সেরেই কাজে বসব। মেনুটা কালকের মতো হলেই ভাল হয়।"

বসুবাড়িতে ফোনটা গেল, আনন্দাঙ্গ করতে এতটুকু মাথা ঘামাতে হল না ঝিনুককে।

প্রায় ঘন্টাদুয়েক হল ঝিনুকরা বসুবাড়িতে এসেছে। মুড়ি-ঘুগনি, মিষ্টি, কলা দিয়ে জলখাবার খাওয়া হল। আজ মিষ্টি আর ঘুগনি অন্য প্রকারের। দীপকাকুর মতো ঝিনুক আজ মুড়িতে জল ঢেলে খেয়েছে। মন্দ লাগেনি। স্টাডিতে দীপকাকু আবার বই, ফাইলের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন। ঝিনুক যথারীতি বোর হচ্ছিল। ভাগ্যিস স্টাডির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল সুশোভনবাবুর ভাইয়ের মেয়ে পুলকিতা। দরজা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুলকিতার সঙ্গে গল্প জুড়েছে ঝিনুক। একে অপরের বিষয়, কলেজ নিয়ে কথা হল। পুলকিতা জানাল, সে ভাবতেই পারেনি ঝিনুক কলেজ পড়তে-পড়তে ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করে। ঝিনুক ক্যারাটে জানে শোনার পর পুলকিতার চোখ বিস্ময়ে বড়-বড়, ভীষণ অবাক হয়েছে সে। জানাল তারও খুব ইচ্ছে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারাস কাজ করার। ঝিনুক বলেছে, "তুমি কলকাতায় থাকলে সেটা সম্ভব হত। দীপকাকুকে বলে কোনও একটা কেসে তোমায় সঙ্গে নিতাম।" মিথ্যে বলেছে ঝিনুক, মোটেই সে নিত না। যেচে কেউ কমপিটিটর বাড়ায়!

এই মুহূর্তে পুলকিতা বলছে, "তোমার কথা আমার বন্ধুদের বলেছি। তারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। শুনবে তোমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স..."

বাকি কথা কানে ঢুকছে না ঝিনুকের। দেখছে, স্টাডির দিকে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসছেন ডাক্তারবাবু, শ্যামল বারিক, বলাইবাবু আর আর্মি। হলটা কী?

ওই চারজনের সঙ্গেই স্টাডিতে ঢুকল ঝিনুক আর পুলকিতা। চেয়ারে বসা দীপকাকু ঘাড় ফেরালেন ভিড়ের দিকে। ডাক্তারবাবুর

boiRboi.blogspot.com

উদ্দেশে বললেন, "আপনাদের চারজনকে ডেকে পাঠানোর কারণ, প্রবোধবাবু কি কখনও এ বাড়ির চৌহদ্দিতে কোনও কনষ্টাকশন তোলার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন? আপনাদের এই চারজনের সঙ্গেই ওঁর কথা হত বেশি।"

আর্যসহ চারজন 'না' সূচক মাথা নাড়লেন।

দীপকাকু বলছেন, "প্রবোধবাবুর নথিপত্র থেকে যা পেলাম, মনে হচ্ছে উনি এই বাড়ির একটা অংশে টুরিস্ট লজ বানাতে চেয়েছিলেন। মোগলমারির বৌদ্ধবিহার দর্শনার্থীর জন্য একটা লজ বানিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে বহুবার আবেদন করেছেন। সে সব চিঠিপত্রের কপি ওঁর একটা ফাইল থেকে পেয়েছি। সরকারের সাড়া না পেয়ে নিজের জমিতেই লজ বানানোর পরিকল্পনা নিতে থাকেন। এই বাড়ির পুরনো একটা ব্লুপ্রিন্ট প্ল্যান ওঁর কাছে আছে, তার থেকেই বাগানের ধারে লজ বানানোর জন্য একটা আলাদা ম্যাপ আঁকেন। যেহেতু উনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নন, ম্যাপ ছিল সাদামাটা, খুব ডিটেলে আঁকা ছিল না। নিজের মতো একটা রাফ কপি করেছিলেন। কোনওভাবে সেই ম্যাপ আবারও কপি হয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে চলে যায়। তারা ভাবে ওই ম্যাপে বুঝি গুপ্তধনের নির্দেশ আছে। খুঁড়ে ফেলে বাগানের মাটি।"

"কীভাবে ম্যাপটা অন্যের হাতে গেল? বাবা যখন আমাদের সঙ্গেই এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি," প্রশ্ন রাখলেন ডাক্তারবাবু।

দীপকাকু উত্তরে বললেন, "সম্ভবত ভাবনাটা ওঁর প্রাথমিক স্তরেই ছিল। কোনও রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। লজের প্ল্যানের একটা কপিও দিয়েছিলেন। হয়তো সেটাই কোনওভাবে বেহাত হয়েছে।"

বলাইবাবু বলে উঠলেন, "বড়কর্তা ডাক্তারি চেম্বার বাড়ির বাইরে করলেন। লজটা ভিতরের জমিতে করে উঠতে চাইবেন কেন?"

"কারণ ওর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর ছিল না। পাঁচিলের উলটো দিকে চওড়া রাস্তা, রাস্তার ওপারে মাঠ। যেখানে টুরিস্টদের গাড়িগুলো পার্ক করা যাবে," বলে থামলেন দীপকাকু, "ফের নিজেই বলতে থাকেন, আসলে ওঁর বয়স হয়ে যাচ্ছিল, জীবনের অনেকটা সময় মোগলমারি প্রকৃতিকে নিয়ে কাজ করেছেন। সেভাবে প্রচার প্রসার হচ্ছিল না, যা সব চেয়ে বেশি টুরিস্টদের মাধ্যমেই হয়। সেই কারণেও লজটা তৈরি করার জন্য মরিয়া আগ্রহ তৈরি হয়ে থাকতে পারে।"

"এটা কিন্তু একেবারে রাইট পয়েন্ট। দাদু প্রায়ই আক্ষেপ করতেন মোগলমারির প্রচার নিয়ে," বলল আর্য।

দীপকাকু টেবিলে রাখা একটা ফাইল হাতে তুলে বললেন, "এটাতে বাড়ির পুরনো ব্লু প্রিন্ট থেকে শুরু করে আরও অনেক ম্যাপ আমি স্টাডি থেকে খুঁজে-খুঁজে জমা করেছি। ব্লু প্রিন্টটা বাদে সবই প্রবোধবাবুর হাতে আঁকা। আমার ধারণা এখানেই হদিশ পাব চারশড়া মোহরের। গুগুলো কোথায় রেখেছেন, নির্ঘাত তার ম্যাপও করা আছে। ফাইলটা নিয়ে আমি বাংলোয় বসে ঠান্ডা মাথায় ম্যাপগুলো দেখব, তারপর ফেরত দিয়ে যাব। চব্বিশটা ম্যাপ আছে এই ফাইলে, আপনারা যদি কেউ গুনে দেখতে চান, দেখে নিন। এমনও তো হতে পারে চারশড়া মোহরের ম্যাপটা চিনে নিয়ে আমি সরিয়ে রাখতে পারি।"

"ছিঃ ছিঃ, এ কী বলছেন! আমরা কি এতটাই খারাপ লোক, যে আপনাকে অবিশ্বাস করব! সব ম্যাপ আপনি যতদিনের জন্য ইচ্ছে নিয়ে যান," বললেন ডাক্তারবাবু।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন দীপকাকু। বললেন, "এবার তা হলে বাংলোয় ফিরি।"

"লাঞ্চ এ বাড়িতেই করে গেলে ভাল হত না?" অনুরোধ রাখলেন ডাক্তারবাবু।

ঘরের মাঝে চলে এসেছেন দীপকাকু। অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ, লাঞ্চ বাংলোয় গিয়েই করব।"

"তা হলে মাথার ব্যাণ্ডেজটা খুলে দিই? ওটার আর দরকার নেই। এবার একবার ড্রেস করে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দেব," এটা বললেন শ্যামল বারিক।

ঝিনুকরা এখন বাংলোর পথে। দীপকাকু এখন আগের চেহারায়, মাথায় ব্যাণ্ডেজ নেই। বেশ স্বস্তি পাচ্ছে ঝিনুক। শ্যামল বারিক কাজের কাজ করেছেন ফেট্টিটা খুলে দিয়ে। উনিই প্রতিবারের মতো গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চলেছেন বাংলোয়।

হাইওয়ে ছেড়ে গাড়ি দাঁতনের রাস্তা ধরতেই শ্যামল বারিক সামনের ধাবাটা দেখিয়ে বললেন, "খাওয়া হয়েছে এখানে?"

"হ্যাঁ, গতকালই বাংলোয় আনিয়ে খেয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, বেশ ভাল রান্না," দীপকাকু মন্তব্য করলেন।

গাড়ির স্পিড কমিয়ে শ্যামল বারিক বলেন, "লাঞ্চটাইম তো হয়েই গিয়েছে, আজ এখানে বসেই খান। পছন্দমতো আইটেম চেয়ে নিতে পারবেন।"

"সেই ভাল। দাঁড় করান গাড়ি। আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে খেতে," বললেন দীপকাকু।

ধাবা থেকে সামান্য এগিয়ে গাড়ি পার্ক করলেন বারিক। কাস্টমারের যাতায়াতের রাস্তা পরিষ্কার রাখলেন। ঝিনুক প্রথমে গাড়ি থেকে নামল, দীপকাকু নামলেন বগলে ফাইল নিয়ে। ওটা ওঁর কাছে এখন ভীষণ জরুরি, জানলার কাচ তোলা বন্ধ গাড়িতেও রাখার ঝুঁকি নিচ্ছেন না। গাড়ি থেকে নেমে চাবির সুইচ টিপে দরজা লক করলেন শ্যামল বারিক।

ধাবায় খুব তৃপ্তি করে খেলেন দীপকাকু। মাছ, মটন দু'রকমই খেয়েছেন। ঝিনুক চিকেন, শ্যামলবাবু মাছ। এছাড়া কম্পালসারি অন্যান্য পদ তো আছেই। বিল মেটালেন দীপকাকু। মৌরি চিবোতে-চিবোতে তিনজনই এখন ধাবার বাইরে। দীপকাকু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ফখার করলেন শ্যামলবাবুকে। উনি মাথা নেড়ে "থ্যাঙ্ক ইউ" বললেন।

বগলের ফাইল সামলে দীপকাকু সিগারেট ধরাতে যাচ্ছেন, ঝিনুকের চোখ গেল সামনে। মাঝরাস্তা ছেড়ে একটা মোটরবাইক স্পিড কমিয়ে তাদের দিকে আসছে। ব্যাপারটা কী? সজাগ হয় ঝিনুক।

বাইক থামল দীপকাকুর সামনে। স্টার্ট অবশ্য চালু আছে। হেলমেট-পরিহিত আরোহী দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করল, "হাইওয়েটা কোন দিকে?"

দীপকাকু আঙুল তুলে দেখাতে গেলেন, আরোহী ওঁর বগল থেকে ফাইল টেনে নিয়ে বাইকটার স্পিড তুলল। কালক্ষেপ না করে ঝিনুক স্পট জাম্প দিল ছুঁতন্ত বাইক লক্ষ করে এবং দেখল তার ক্যারাটে শিক্ষা ফলে যায়নি। বাইকের পিছনটা ধরতে পেরেছে ঝিনুক, বাকি শরীর রাস্তায় আছাড় খেয়েছে। বাইক থেকে ছিটকে পড়েছে আরোহী, রাস্তায় কাত হয়ে গিয়েছে মোটরবাইকটা, চাকা ঘুরছে, আওয়াজ হচ্ছে ইঞ্জিনের। হেলমেট খুলে ফেলে ফাইল নিয়ে দৌড়চ্ছে আরোহী। ইয়াং ছেলে। ঝিনুক ওর পিছনে স্প্রিংট টানছে। নিজের দৌড়ের স্পিডে আস্থা আছে ঝিনুকের, কিন্তু তাকে টপকে গিয়ে ছেলেটাকে ধাওয়া করছেন শ্যামল বারিক, অ্যাথলেট ছিলেন নিশ্চয়ই। ছিনতাইবাজও কিছু কম যায় না। ভালই দৌড়চ্ছে! আদৌ ধরা যাবে তো? এমন সময় টায়ার ফাটার শব্দ। ছিটকে পড়ল ছিনতাইবাজ। তা হলে কি গুলি চালালেন দীপকাকু?

চকিতে পিছন ফেরে ঝিনুক, ঠিক তাই দীপকাকু পিস্তল তাক করেছেন সামনে। কিন্তু ছিনতাইবাজ যে আবার উঠে দাঁড়াল! হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফাইল না তুলেই সে এবার দৌড় লাগিয়েছে। দীপকাকুর ফায়ারটা তার মানে ব্ল্যাঙ্ক ছিল। ভয় পাওয়ানোর জন্য শূন্যে গুলি। ছেলেটা আওয়াজ শুনেই ভেবেছিল গুলি লেগেছে তার, ঘাবড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল। ফাইল তুলতে সময় নষ্ট না করে এখন প্রাণ বাঁচাতে দৌড়চ্ছে। ঝিনুক পিছিয়ে পড়লেও, শ্যামল

boiRboi.blogspot.com

বারিক ছেলেটার কলার ধরে ফেললেন, ছেলেটা একঝটকায় তাঁর হাত ছাড়িয়ে হাইওয়ের দিকে বেঁকে গেল। শ্যামল বারিক হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ঝিনুক ওঁকে টপকে গিয়ে হাইওয়েতে উঠল, কোথাও দেখা যাচ্ছে না ছিনতাইবাজকে। হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে যেন! এই সময় কোনও বাস এসেছিল কি? ছিনতাইবাজ সেটা ধরে পালাল? ঝিনুক পিছন ফেরে, শ্যামল বারিক হাঁটুতে দু'হাত রেখে দম নিচ্ছেন। যতই হোক এখন তো আর ইনি ইয়াং নন। দীপকাকু ফাইলটা তুলে নিচ্ছেন রাস্তা থেকে।

॥ ৫ ॥

আজ মোগলমারিতে থাকার শেষ দিন। হয়তো শেষবারের জন্য ঝিনুকরা চলেছে সুশোভনবাবুর বাড়ি। তবে ওঁদের গাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না। কেয়ারটেকার কার্তিক জানা ঝিনুকদের ভাড়ার গাড়ি ঠিক করে দিয়েছে। সুশোভনবাবুর বাড়ি হয়ে এই গাড়িতেই ঝিনুকরা যাবে দীপকাকুর দেশের বাড়ি, কনকপুর। কাল ওখান থেকে বালিচক স্টেশনে গিয়ে কলকাতা ফেরার ট্রেন ধরা হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাংলোর বারান্দায় চা খেতে বসে দীপকাকু জানিয়েছিলেন, "সুশোভনবাবু, কেস সল্‌ভ করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে এবেলাতেই ধরে ফেলতে পারব অপরাধীকে। ফেরার পথে ভাবছি দেশের বাড়ি যাব। বহুদিন যাওয়া হয়নি। থাকব একটা রাত।"

'দেশের বাড়ি' যাওয়া হবে শুনে খুবই খুশি হয়েছিল ঝিনুক। তার অনেকদিনের ইচ্ছে দীপকাকু কোন পরিবেশে বড় হয়েছেন, সেটা দেখার। এদিকে দীপকাকুর হাবভাব তার ঠিক সুবিধের ঠেকছে না। এর আগে কোনও কেস সল্‌ভ করার পর এত নিরাসক্ত থাকেননি। ঝিনুক তাই বলেছিল, কেসটা সমাধান করে তেমন একটা আনন্দ পাননি মনে হচ্ছে। কারণটা কী?

"একেবারে ঠিক ধরেছে। আনন্দ পাইনি। কে বাগান খুঁড়িয়েছে ধরতে পেরেছি। কিন্তু মোহরের ব্যাপারটা অধরাই থেকে যাচ্ছে। যদিও মোহর খোঁজার অ্যাসাইনমেন্ট আমায় দেননি সুশোভনবাবু। মোহরের সন্ধান কে তাঁর বাড়িতে চালাচ্ছে, তাকে শনাক্ত করতে বলেছিলেন। সে দিক থেকে আমার এখানকার কাজ কমপ্লিট। মোহরের ব্যাপারটা সল্‌ভ করতে পারলে নিজের ভালো লাগত," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক তখন জানতে চায়, "কেসটা সল্‌ভ কীভাবে করলেন, কে অপরাধী, বলা যাবে?"

"ওদের যখন বলব, তখনই শুনো," দীপকাকুর একথার পর ঝিনুক আর প্রসঙ্গটা টানেনি। কাল কের সিচুয়েশন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ছিনতাইবাজের ফাইল উদ্ধার হওয়ার পর দীপকাকু নিজের ঘরে বসে রাত আটটা পর্যন্ত প্রবোধবাবু ম্যাপ নিয়ে কাজকর্ম করলেন। ঝিনুক ওঁকে বিরক্ত করেনি। টিভি দেখে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট করে সময় কাটিয়েছে। কেসের গতিপ্রকৃতি জানাতে বাবাকেও ফোন করেছিল ঝিনুক। ফাইল উদ্ধারে নিজের কৃতিত্ব জানাতে ভোলেনি। বাবা জানতে চাইলেন, "ফার্স্টএড নিয়েছিলি? ব্যথা আছে পায়ে?"

ঝিনুক বলেছিল, "নেই।" মিথ্যে বলেছিল, বাবাকে দুশ্চিন্তায় রাখতে চায়নি। ব্যথা এখনও আছে। ফার্স্টএড দীপকাকু নিজের হাতে করে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে ব্যথার একটা ওষুধ খেতে হবে।

বাবার সঙ্গে কথা হওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই দীপকাকু রুমের দরজায় এসে বলেছিলেন, "রেডি হও। ফাইলের কাজ শেষ। ওদের বাড়িতে দিয়ে আসি। গাড়ি পাঠাতে বলেছি।"

শ্যামল বারিকই গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "পেলেন কিছু ফাইল থেকে?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "মনে তো হচ্ছে পেয়েছি। এখন দেখা যাক।"

বসুবাড়ি পৌঁছে সোজা প্রবোধবাবুর স্টাডিতে চলে যান দীপকাকু। ডাক্তারবাবু দেখা করতে এলেন। শ্যামলবাবু, বলাইবাবু, আর্যকে ডাক্তারবাবু ভায়া ডেকে পাঠিয়েছিলেন দীপকাকু। সকলে জমা হওয়ার পর ফাইল থেকে একটা ম্যাপ বের করে বলেছিলেন, "আমার ধারণা এই ম্যাপটাই মোহর থাকার হদিশ দিচ্ছে। কিন্তু বাড়ির প্ল্যানের ব্লুপ্রিন্ট দেখে আমি এখনও জায়গাটা নির্দিষ্ট করতে পারছি না।"

"তা হলে কি বাড়ির বাইরে কোথাও রাখা আছে মোহর?" জানতে চেয়েছিল আর্য।

দীপকাকু বলেছিলেন, "সেটা বোঝার জন্য ব্লুপ্রিন্ট আর এই ম্যাপের ফোটো তুলে আমায় এক্ষুনি কলকাতায় পাঠিয়েছি। সে কী বলে দেখা যাক। ফাইলটা স্টাডিতে থাক আপাতত। বন্ধুর ফোন পাওয়ার পর এটা নিয়ে মুভ করব।"

এর পর দীপকাকু ফাইলটা আলমারিতে তুলে রাখতে বলেছিলেন বলাইবাবুকে। কারণ, চাবি ওঁর কাছে থাকে। একই সঙ্গে বলেন, "আমি আরও একঘণ্টা মতো কাজ করব এখানে। তারপর ফিরব বাংলোয়।"

ওই একঘণ্টা ঝিনুককে ঘরে থাকতে দেননি দীপকাকু। বলেছিলেন, "তুমি মিছিমিছি এখানে বোর হবে কেন? যাও, নতুন বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে গল্প করো।"

পুলকিতার কথা বলেছিলেন দীপকাকু। আসলে উনি চাননি ঝিনুক ওই সময় স্টাডিতে থাকুক। ঝিনুক নীচের তলায় গিয়ে শুধু পুলকিতা নয়, বাড়ির সবার সঙ্গেই আড্ডা জমাল। একঘণ্টা বাদেই ফিরে এসেছিল স্টাডির সামনে। দেখেছিল দীপকাকু তালা দিচ্ছেন ঘরটার দরজায়, পাশে দাঁড়িয়ে বলাইবাবু। চাবি বলাইবাবুর হাতে দিয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "ঘরটায় কাগজপত্র সব ছড়ানো-ছেটানো আছে। আমি কাল এসে আবার কাজে হাত দেব। এর মাঝে কেউ যেন এ ঘরে না ঢোকে। কাগজ এদিকওদিক হলে কাজে অসুবিধে হবে আমার।"

"কেউ ঢুকবে না," বলেছিলেন বলাইবাবু।

কাল মনে হয়েছিল দীপকাকু প্রায় মোহরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন, আজ বলছেন, মোহরের ব্যাপারটা অধরা থেকে যাচ্ছে।

ঝিনুকরা এখন সুশোভনবাবুর ড্রয়িংরুমে। এবাড়িতে ঢুকে দীপকাকু প্রথমে ছাদে গিয়েছিলেন, তারপর এলেন স্টাডিতে। সঙ্গে ঝিনুক ছাড়াও ছিলেন বলাইবাবু। ড্রয়িংরুমে এসে দীপকাকু বলাইবাবুকে বললেন, "ডাক্তারবাবু, আর্য, শ্যামলবাবুকে এ ঘরে ডাকুন, আপনিও থাকবেন।"

দীপকাকুর কথামতো সকলেই এখন ড্রয়িংরুমে উপস্থিত। বলাইবাবুই শুধু দাঁড়িয়ে, বাকিরা সোফায়। দীপকাকুর নির্দেশে দরজার ছিটকিনি লাগিয়েছেন বলাইবাবু। ঘরের সবাই এখন দীপকাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলা শুরু করলেন দীপকাকু, "মোহরের সন্ধান আমি এখনও পাইনি। তবে এটা বলব, বিষ্ণুবাবু প্রবোধবাবুর হাতে মোহরই দেখেছিলেন। ডাক্তারবাবু যেহেতু আমায় মোহর সন্ধানের জন্য ডাকেননি, তাই ওই কাজটা এখন করছি না। 'করছি না' বলাটা ভুল হবে। মোহর সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছি আমি। ডাক্তারবাবু চেয়েছিলেন এ বাড়িতে কে বা কারা মোহরের খোঁজে হানা দিচ্ছে তাদের ধরতে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি প্রমাণ হত এবাড়িতে প্রাচীন মূল্য আছে অথবা নেই, ভালই হত। প্রকাশ পেত সত্যটা। মোহর প্রবোধবাবু পেয়েছিলেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু সে সব কোথায় রেখেছেন, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হল না," একটু দম নিয়ে দীপকাকু ফের বলে ওঠেন, "মোহরের সন্ধানে এবাড়িতে হানা দিচ্ছিলেন একজনই, শ্যামল বারিক।"

সোফা থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন শ্যামলবাবু। রাগের গলায় বললেন, "কী যা-তা বলছেন আপনি! এতদিন ধরে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাজ করছি, কোনও খারাপ রেকর্ড আছে আমার? অসৎ কাজ করেছি কখনও?"

"আপনি বসুন। আমায় বলতে দিন," হাতের ইশারাতে শ্যামল বারিককে বসার নির্দেশ দিলেন দীপকাকু। বলতে লাগলেন, "এবাড়িতে এতদিন অ্যাটাচড থাকার কারণেই প্রবোধবাবুকে ভাল করে অবজ্ঞার

boiRboi.blogspot.com

করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মনে হয়েছিল মোহর থাকতে পারে ওঁর কাছে। আপনি বিষ্ণুবাবুর সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছিলেন। মোহর পাওয়ার ঘটনা কতটা সত্যি বুঝতে। মাইতি বাড়ির লোক ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসা না করালে এলেও, আপনার থেকে পরামর্শ, ওষুধ দুই-ই নিত। বিষ্ণুবাবু ঘরে আমি স্যাম্পেলফাইল ছাপ মারা ওষুধ দেখেছি। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা যে ফাইল ডাক্তারদের দেয়। এ গ্রামে একজনই ডাক্তার, যার কম্পাউন্ডার আপনি,'' বলে ফের থামলেন দীপকাকু। এখন আর শ্যামল বারিকের মুখে কথা নেই। বসে পড়েছেন সোফায়।

আবার দীপকাকু বলা শুরু করলেন, ''আমাকে ওভাবে মারার পর থেকেই আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ে শ্যামল বারিকের উপর। কেননা মারটা ছিল একেবারে ডাক্তারি মার। এমন জায়গায় আঘাত আনতে হবে, ব্যক্তি যেন অজ্ঞান হয়, বেশি চোট না লাগে। তা হলে আবার থানা-পুলিশ হবে। শ্যামলবাবু ঝিনুককে বলেছিলেন, আমাতকা সৌভাগ্যবশত ওখানে লেগেছে। আসলে কিন্তু জেনেবুঝেই মাথার ওই জায়গায় মারা হয়েছিল। ডাক্তারবাবু আমাকে তদন্ত করতে ডেকে এনে মারবেন, এরকম কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ আমি খুঁজে পাইনি। তা হলে পড়ে রইল কম্পাউন্ডার। সনাতন বেরার ছেলে আমার জান ফিরিয়ে ছিল। তাকে বলেছিলাম ওদের বাড়ির আশপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে কোনও কাপড় বাঁধা লাঠি আছে কিনা দেখতে। ডাক্তারি গজ বাঁধা লাঠি ঝোপঝাড় থেকে উদ্ধার করেছে প্রতাপ। ফোন করে সে কথা আমাকে জানিয়েছে। আমি ওটা যত্ন করে রেখে দিতে বলেছি, সাক্ষ্য প্রমাণের কাজে লাগবে। অতটা ডাক্তারি গজ পাওয়া শ্যামলবাবুর পক্ষেই সম্ভব। আমাকে মারার কারণ, শ্যামলবাবু চেয়েছিলেন আমি যাতে ভয় পেয়ে অ্যাসইনমেন্টটা ছেড়ে চলে যাই। আর হ্যাঁ, প্রতাপ বেরার কাছেই আমি জেনেছি তার বাবার কান সত্যিই খারাপ। সদ্য বাবাকে হিয়ারিং এড কিনে দিয়েছে সে। ওই যন্ত্রের কারণেই বাড়ির পিছনে আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল সনাতন বেরা। অর্থাৎ ডাক্তারবাবু আমাদের মিথ্যে বলেননি,'' থামলেন দীপকাকু।

দম নিয়ে ফের বলতে থাকেন, ''এর পর আমি খুঁজতে থাকি রাস্তা, যে পথ দিয়ে অপরাধী স্টাডিতে ঢুকছে। আগে ঢুকত না। প্রবোধবাবু অসুস্থ হওয়ার সুযোগটা নেয়। উনি যদি দেখেও ফেলেন, বাড়ির লোক ভাববে অসুস্থতার কারণে দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। প্রবোধবাবু এক-দু'বার দেখেওছেন তাকে, আলমারির আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছে সে, মানে শ্যামলবাবু। প্রবোধবাবু অন্যমনস্ক হলেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে অপরাধী কীভাবে উধাও হত, এটার বোঝার জন্য আমি অেমন বাড়ির নানান জায়গায় চোখ বুলিয়েছি, তেমনি ছাদেও যাই। তখনই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় অপরাধীর ঢোকা-বেরনোর রাস্তা। শ্যামলবাবু স্টাডিতে আসার জন্য চেম্বার ঘরের পিছনের দরজা ব্যবহার করতেন। ওখান দিয়েই বাগান খোঁড়ার মজুর ঢোকান। নিজেকে সন্দেহের বাইরে রাখতে চেয়ে উনি তখন দিব্যায়, ডাক্তারবাবুর ফ্যামিলি টুরে। তার আগে থেকেই এবাড়ির সমস্ত চাবি সময় সুযোগ বুঝে নকল করিয়েছেন শ্যামলবাবু। চেম্বারের চাবিটা মজুরদের কাছে দিয়ে রেখেছিলেন ওইদিনের জন্য। নিজে প্রবোধবাবুর স্টাডিতে আসতেন চেম্বারের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, বাড়ির লোকজনের নজর এড়িয়ে বাগানের রাস্তা পার করে, প্যাঁচানো সিঁড়ি মুখে এসে ছাদে উঠে পড়তেন। সিঁড়ির গোড়ায় কাঁটাতার থাকলেও, ওটা সরানোর সহজ ব্যবস্থা করেছিলেন। স্টাডির দরজায় পৌঁছনোর জন্যে ছাদ থেকে ঝুলে পা রাখতেন কারনিসে। এর জন্য যতটা হাইটের প্রয়োজন, তা ওঁর এবং আর্যর আছে। সন্দেহটা যেহেতু ক্লু অনুযায়ী ওঁর দিকে ঢলে ছিল, আমি আর্যকে নিয়ে ভাবিনি। অ্যাথলিট শ্যামলবাবুর দক্ষতার পরিচয় আমরা পরে পেয়েছি। ওঁর পক্ষে কারনিস থেকে ঝুলে স্টাডির দরজায় পৌঁছনো কোনও কঠিন কাজ নয়। হাতে নকল চাবি আছে, স্টাডিরুমে সহজেই ঢুকে যেতেন। ফিরে আসতেন একই পথে।''

ঘেমে গিয়ে টেবিলের গ্লাস তুলে জল খেলেন দীপকাকু। একটু চুপ থেকে বলতে লাগলেন, ''আমাদের চাবিতে দিয়ে প্রবোধবাবু যখন স্টাডিতে ঢুকে পড়েছিলেন, কথা সূত্রে বলাইবাবুর থেকে জানতে পারি, মাসতিনেক আগে উনি হঠাৎই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। আমার মন বলছিল, যদি ওঁর কাছে মোহর থাকে, রোগের কারণে প্রকৃত মূল্যটা ভুলে গিয়েছেন। মোহর যেহেতু নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন, মূল্য বোঝার জন্য কারও সাহায্য নিতে পারছেন না। কলকাতায় গিয়েছেন সম্ভবত মোহরের কারণেই। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে একমাত্র কোনও অ্যান্টিক শপের মালিকের সঙ্গে। প্রোফেসারদের কাছে কথাটা তুললে বিষয়টা আর গোপন থাকবে না। প্রবোধবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে আমি চাবিটা অ্যান্টিক শপের কার্ড পেয়েছি। যার মধ্যে একটার ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে রাখা ছিল ডায়েরেতে। অর্থাৎ দোকানটি ওঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ভবানীপুরের পুরনো নামী দোকান। কলকাতা পুলিশের রেফারেন্সে দোকানমালিকের সঙ্গে কথা বলি। মালিক জানালেন মাসতিনেক আগে প্রবোধবাবু ওই দোকানে গিয়েছিলেন। চারটে সোনার মুদ্রা দেখিয়ে সময়কাল এবং দাম যাচাই করেন উনি।

''আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম 'ওঁর সঙ্গে কি কেউ ছিল?' দোকান মালিক বললেন, 'যাচাইয়ের সময় কেউ ছিল না।' পরে ওঁর ড্রাইভার এসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবু কি কিছু ফেলে গিয়েছেন?' কাউন্টারের লোক বলেছে, 'না চারটে মুদ্রাই তো নিয়ে গেলেন।' ড্রাইভার বলতে শ্যামলবাবুর কথা মাথায় এল আমার। বাড়ির গাড়ি নিয়ে যখন প্রবোধবাবু গিয়েছিলেন কলকাতায়, শ্যামলবাবুই নিশ্চয়ই ড্রাইভ করেছেন। দোকানমালিক আমাকে বলেন, 'যদি সেই ঘটনার সি সি টি ভি ফুটেজ চান, দিতে পারি। তবে একটু সময় লাগবে।' ফুটেজ হাতে আসার আগে আমি একটা ফাঁদ পাতি। কারণ, ফুটেজে যেহেতু অনেক কারিকুরি করা যায়, আদালত সহজে গ্রাহ্য করে না। এবার ফাঁদটা হল যে, ফাইলে গুপ্তধনের কোনও ম্যাপই ছিল না। ওটা আমি নিজের হাতে বানাই।''

ঝিনুক এখন টের পায়, দীপকাকু কেন নিজের পেনের বদলে প্রবোধবাবুর কালির পেন ইউজ করছিলেন। ওতেই নিশ্চয়ই এঁকেছেন ম্যাপ। বলে যাচ্ছেন দীপকাকু, ''আমি আলমারির সামনেটায় ইউ ভি পাউডার ছড়িয়ে দিই। আজ এ ঘরে বসার আগে আলমারির সামনে আলটা ভায়োলেট টর্চ মেরে ফুটপ্রিন্ট দেখেছি আমি, ফাইল থেকে আমার আঁকা নকল ম্যাপটাও উধাও। ছাদে গিয়েও দেখেছি কিছু ফুটপ্রিন্ট আছে। আমি নিশ্চিত পুলিশ ডেকে ফরেনসিক করালে শ্যামলবাবুর পায়ের ছাপের সঙ্গে ওগুলো মিলে যাবে।''

দু'হাতের তালুতে মুখ ঢাকা দিয়ে মাথা নিচু করে নিয়েছেন শ্যামলবাবু। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। ঝিনুক অবাক হয়ে ভাবে, দীপকাকু এত কাজ করলেন, সে পাশে থেকেও জানতে পারল না! একেই বলে বোধ হয় কাক-পক্ষীতে টের না পাওয়া। ফের দীপকাকু বলতে থাকলেন, ''এতক্ষণ যা বললাম, তার সঙ্গে আরও কয়েকটা পয়েন্ট জুড়ে দিই, রবি-অনন্তর গভীর ঘুমের ব্যবস্থা করতে, যে স্প্রে-টা ব্যবহার করিয়েছিলেন শ্যামলবাবু, সেটা এই এলাকায় ওঁর পক্ষেই জোগাড় করা সহজ। খড়গপুরে ওষুধ কিনতে যান, দোকানদারদের সঙ্গে ভালই হৃদ্যতা। ওদের থেকেই জোগাড় করেছিলেন ওই স্প্রে। দু'নম্বর পয়েন্ট হল, আমার থেকে ফাইল ছিনিয়ে নেওয়ার যে চেষ্টাটা হল, সেটা শ্যামলবাবুর নির্দেশে, ফোনের মাধ্যমে। বারবার চাইছিলেন আমরা এই ধাবায় যাই। তখন হয়তো ফাইলটার ব্যাপারে অন্যমনস্ক হব, ছিনতাইবাজ ছিল কাছাকাছি, শ্যামলবাবুর ফোনের অপেক্ষায়। যাকে ধরেও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।''

এমনভাবে শ্বাস ছাড়লেন দীপকাকু, মনে হচ্ছে বক্তব্য শেষ। এদিকে ঝিনুকের যে আর-একটা ব্যাপার জানা বাকি। বলে ওঠে, ''যে চারটে ছেলে গেটের কাছে এসে বিশুমালির সঙ্গে কথা বলেছিল। তারা কারা?''

"ওরা চোরাই প্রত্নবস্তুর দালাল নয়। পুলিশকে ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম। লোকাল থানা আমাকে কনফার্ম করেছে ওরা টুরিস্ট। ব্যস, আমার বলা শেষ," দীপকাকু থামতেই শ্যামল বারিক ঝোঁকা অবস্থায় সোফা থেকে উঠে এসে ডাক্তারবাবুর পায়ে পড়লেন। কান্নার স্বরে বলতে লাগলেন, "আমায় ক্ষমা করে দিন। আরও কখনও এমন হবে না। আমায় দয়া করে একটা সুযোগ দিন।"

বিরক্তির গলায় সুশোভনবাবু বলে উঠলেন, "অ্যাই, তোমরা সকলে এখন ঘর থেকে যাও তো। শ্যামলটাকেও নিয়ে যাও। বাগচীবাবুর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

সকলে বলতে ঝিনুক নিশ্চয়ই নয়, ঝিনুক রইল ঘরে। বাকিরা বেরিয়ে গেল। একটু ঝুঁকে ডাক্তারবাবু দীপকাকুকে বললেন, "কী করি বলুন তো? শ্যামলকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দিই, নাকি পুলিশ ডাকব?"

"সেটা সম্পূর্ণ আপনার সিদ্ধান্ত। তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, মোহর কিন্তু আপনার বাবা পেয়েছিলেন। সেটা চারটে, না চারঘণ্ডা এখনও বোঝা যায়নি। চারটে স্যাম্পেল হয়তো নিয়ে গিয়েছিলেন অ্যান্টিক শপে। ওই মোহরের জন্য আবারও আপনার বাড়িতে হানা দিতে পারে চোরেরা।"

"আপনি যখন এ বাড়িতে মোহর পাননি, তা হলে সেটা এখানে নেই। আপনার কাজ দেখে এব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি। লোকজনকে বলবও সে কথা, তখন দেখবেন আর হানা দিচ্ছে না কেউ," বলার পর সুশোভনবাবু জানতে চান, "আপনার ফিজ চেকে দিলে অসুবিধে নেই তো? আমি এখনই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে টাকা ফেলে দিতে পারি আপনার অ্যাকাউন্টে, নেট কানেকশন পাওয়া নিয়ে সমস্যা হয় এখানে।"

"চেক-ই দিন," বললেন দীপকাকু।

॥ ৬ ॥

গাড়ি চলেছে কনকপুরের উদ্দেশে। দীপকাকুর দেশের বাড়ি, অথচ ওঁর মুখে হাসি নেই। পকেটে ভাল অ্যামাউন্টের চেক, তবু মুখ গম্ভীর! গাড়িতে ওঠার খানিক পর ঝিনুককে বলেছিলেন, "কেসটা নিজের কাছে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আমার পেশায় এরকম ঘটনা ঘটল এই প্রথম।"

মোহরের হদিশ পাননি বলে আক্ষেপ যাচ্ছে না দীপকাকুর। ঝিনুক এই কেসটা নিয়ে আর কিছুই ভাবছে না। গাড়ির জানলা দিয়ে দেখছে গ্রামবাংলার রূপ। একটা জিনিস অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছে, ব্যাপারটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেতে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "এখানে দেখছি সব ক'টা বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ। বেশ আলাদা করে যত্ন নিয়ে বানানো হয়েছে। যত এগোচ্ছি শেপ পালটে যাচ্ছে মঞ্চগুলোর। মোগলমারিতে দেখলাম কিছু তুলসীমঞ্চে বৌদ্ধস্তূপের আদল।"

"ড্রাইভার, গাড়ি থামাও," রীতিমতো চেঁচিয়ে বলে উঠলেন দীপকাকু।

গাড়ি ঘুরিয়ে ঝিনুকরা চলে এসেছে বসুবাড়িতে। প্রবোধবাবুর উৎখননের অ্যাপারেটাস নিয়ে দীপকাকু এবাড়ির তুলসীমঞ্চের সামনে উবু হয়ে বসেছেন। চৌকো টাইল দিয়ে বাঁধানো ফিটচারেক উচ্চতার মঞ্চ। টাইলের জোড়ে আঙুল বোলাচ্ছেন দীপকাকু। এই চাতালেই মহোৎসব হত সুশোভনবাবুর মায়ের আমলে। এবাড়ির কাজের লোকসহ সকলেই মঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। দীপকাকু বলছেন, "এই মঞ্চেই সোনার মুদ্রা থাকার কথা, যা এতদিন ধরে খোঁজা হচ্ছে।" মঞ্চটা সারনাথ স্তূপের আদলে। মোগলমারি বিহারের মধ্যে ছোট আকারের সারনাথ ধরনের স্তূপ ছিল। দীপকাকুর মত, প্রবোধবাবু এখানকার বিহারের প্রতি এতটাই একাগ্রতা বোধ করতেন, বাড়ির তুলসী মঞ্চ ওই আদলে বানান।

মঞ্চের নীচের বেদির একটা টাইল খোলার চেষ্টা করছেন দীপকাকু। ব্যবহার করছেন প্রবোধবাবুর যন্ত্রপাতি। খুলে গেল টাইলটা। দীপকাকু বের করলেন পাতলা, আয়তকার ধাতুর ছোট একটা বাক্স। ভিড়ের কেউ বোধ হয় শ্বাস নিচ্ছে না। এতটাই নিস্তব্ধ আশপাশ। বাক্সর ঢাকনা খুলে ফেললেন দীপকাকু, ঝিকিয়ে উঠল চারটে মোহর। রীতিমতো শব্দ 'আ' করে উঠল বাড়ির কিছু লোক। দীপকাকু বাক্স হাতে সুশোভনবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাক্স থেকে বের করলেন একটা কাগজ। বললেন, "দেখুন এখানে লেখা আছে, 'এটি গুপ্তযুগের মুদ্রা। আবিষ্কারক, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার বসু।' মুদ্রাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন আবিষ্কারক হিসেবে নিজের নাম পেতে। বিষ্ণুবাবু না মারা যাওয়া পর্যন্ত এই স্বীকৃতি তাঁর একার জুটত না। বাগড়া দিতেন বিষ্ণু মাইতি। বেশিদিন হয়নি, মুদ্রা চারটে এখানে রেখেছেন। তুলনামূলক অরক্ষিত জায়গায় ছিল। অ্যান্টিক শপ থেকে মুদ্রাগুলোর গুরুত্ব জানার পর স্থির করেন, এগুলো এমন জায়গায় রাখবেন, যা পুরোপুরি সুরক্ষিত। জায়গাটা উনি আপনাকে বলে রাখতে চেয়েছিলেন। মস্তিষ্ক বিকল হতে থাকার কারণে উনি আপনাকে সাবধান করলেও, লুকনোর জায়গাটা ঠিকমতো বলে উঠতে পারেননি। উনি শুধু স্তূপ বলে এই মঞ্চটাকে বোঝাতে চাইছিলেন। 'স্তূপ' কথাটা স্পষ্ট করে উচ্চারণও করতে পারছেন না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আবিষ্কার তো বাবা-ই করেছেন। বিষ্ণুকাকা ছিলেন দূরে। আমি মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে মুদ্রাগুলো তুলে দিয়ে আবিষ্কারক হিসেবে বাবার নাম দিতে বলব।"

গলায় হঠাৎ করে বিনয়ের সুর এনে দীপকাকু বললেন, "আবিষ্কার প্রসঙ্গে যদি দু'কথা লেখা হয়, প্লিজ ঝিনুকের নামটা দিতে বলবেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে। ও যদি স্তূপের কথা না খেয়াল করাত, মুদ্রাগুলো ফের চলে যেত কালের গহ্বরে। হিসেবমতো ঝিনুকও তো এখানে আবিষ্কারক।"

লজ্জায় ভিড় থেকে পিছোতে থাকে ঝিনুক। একজন পেশাদার এবং প্রতিষ্ঠিত ডিটেকটিভের কি এই ধরনের ছেলেমানুষি আবদার বা আবেগ মানায়?

*মোগলমারি জায়গাটি ছাড়া এই কাহিনির সমস্ত কিছুই কাল্পনিক।

boighar.com